অধ্যায় ১২ প্রাণীর আচরণ
Animal Behavior

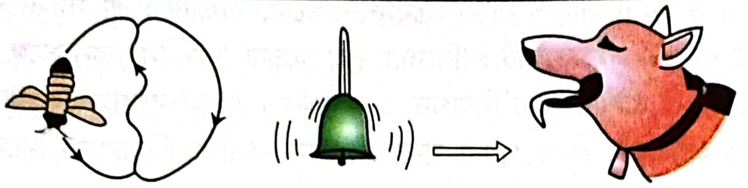

প্রধান শব্দাবলি (Key words)	
❐ ইথোলজি	❐ ট্যাক্সিস
❐ উদ্দীপনা	❐ সহজাত আচরণ
❐ প্রতিবর্ত ক্রিয়া	❐ শিখন আচরণ
❐ অপত্য যত্ন	❐ প্যাভলভ
❐ ইনসটিংক্স	❐ অ্যাল্ট্রুইজম

উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেয়া প্রতিটি জীবের বৈশিষ্ট্য। **বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাপেক্ষে একটি প্রাণীর সাড়া দেয়া বা প্রতিক্রিয়াকে প্রাণীর আচরণ বলে।** সম্পূর্ণ দেহের সঞ্চালন বা অংশবিশেষের সঞ্চালন, দেহভঙ্গি, মুখের ভঙ্গি, স্বর উৎপাদন ভঙ্গি এমনকি বর্ণের পরিবর্তন, গন্ধ সৃষ্টি প্রভৃতি আচরণের অন্তর্গত। জীববিজ্ঞানের যে শাখায় প্রাণীর আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তাকে **আচরণবিদ্যা বা ইথোলজি** (Ethology; গ্রিক *ethos* = আচরণ এবং *logos* = জ্ঞান) বলে। এ অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকৃতির আচরণ পর্যবেক্ষণ, যাচাইকরণ ও প্রাণীর আচরণ সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব	পাঠ পরিকল্পনা	
❐ আচরণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ	পাঠ ১	আচরণ ও আচরণের প্রকৃতি
❐ সহজাত আচরণের ব্যাখ্যা	পাঠ ২	সহজাত আচরণ
❐ প্রতিটি প্রাণীর সহজাত আচরণ যাচাইকরণ	পাঠ ৩	বিভিন্ন প্রাণীর সহজাত আচরণ
শিখন (learning)	পাঠ ৪	অভিপ্রয়াণ
❐ কুকুরের লালার প্রতিবর্তী ক্রিয়ার ওপর Pavlove	পাঠ ৫	প্রতিবর্তি ক্রিয়া
এর কাজের বর্ণনা	পাঠ ৬	সহজাত আবেগ
❐ মৌমাছির সামাজিক সংগঠন এর আলোকে	পাঠ ৭	শিক্ষণ আচরণ
পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার (altruism) ব্যাখ্যা	পাঠ ৮	সামাজিক আচরণ

অস্ট্রিয়ান প্রাণিবিজ্ঞানী **কার্ল ফন ফ্রিস** (Karl von Frisch, 1886-1982) ও **কনরেড লরেঞ্জ** (Konrad Lorenz, 1903-1989) এবং ডাচ জীববিজ্ঞানী **নিকোলাস টিনবার্জেন** (Nikolaas Tinbergen, 1907-1988)-কে ইথোলজির প্রধান স্থপতি হিসেবে গণ্য করা হয়। এ তিনজন বিজ্ঞানী প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাণীর আচরণের উপর অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এজন্য তাঁদেরকে ১৯৭৩ সালে শারীরবিজ্ঞান ও মেডিসিনে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।

Karl von Frisch (1886-1982)

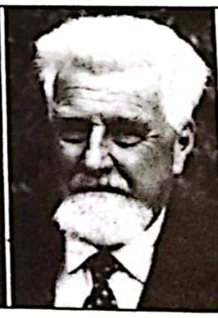

Konrad Lorenz (1903-1989)

Nikolaas Tinbergen (1907-1988)

আচরণের প্রকৃতি (The Nature of Behavior)

বিভিন্ন উদ্দীপনায় সাড়া দেয়ার প্রেক্ষিতে যে কোনো আচরণগত সাড়ার ব্যাপ্তি ও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে। নির্দিষ্ট প্রাণীতে সব সময় একই উদ্দীপনা একই সাড়া ফেলতে পারে না। শুধু পারিপার্শ্বিক অবস্থাই নয়, সাড়া দানে পার্থক্যের বিষয়টি বহিঃস্থ বা অন্তঃস্থ উদ্দীপনার কারণেও ঘটে থাকতে পারে। যেমন–একটি ক্ষুধার্ত প্রাণীর সামনে পেটভর্তি খাবার যে প্রেরণার সৃষ্টি করবে তা ভরপেট প্রাণীতে করবে না।

একটি প্রাণী যদি একদিকে প্রচন্ড ক্ষুধার্ত থাকে, অন্যদিকে শিকারী প্রাণীর ধাওয়ায় দৌড়ের উপরে থাকে আর তখন যদি লোভনীয় খাবার ওই প্রাণীর মুখের সামনে বাড়িয়ে দেয়া হয় তখন তার আচরণ হবে ভিন্ন। বিপদ না যাওয়া পর্যন্ত পলায়নপর প্রাণী কিছুই খাবে না। এভাবে, কোনো আচরণগত সাড়ার ব্যাপ্তি ও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটার পিছনে বিভিন্ন উদ্দীপনার সম্মিলন কাজ করে। বিভিন্ন উদ্দীপনার এ সম্মিলন **মোটিভেশন** (motivation) বা **প্রেরণা** নামে পরিচিত।

কিছু প্রাণীর জননগত আচরণে মোটিভেশন উপাদান জড়িত থাকে। যেমন– অনেক প্রজাতির স্ত্রী সদস্য বছরের নির্দিষ্ট সময় ছাড়া অন্য সময়ে জননে অংশ নেয় না। এ সময়কালটি প্রাণিদেহে রজঃচক্রের (এস্ট্রাস চক্র) সঙ্গে জড়িত থাকে। তখন নিষেক, গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদান ঐ প্রাণীর জন্য নিরাপদ ও অনুকূল। এ আচরণগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে **জৈবনিক ছন্দ** (biological rhythms)। অনেক প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষ সদস্যে এ ছন্দ (বা মোটিভেশন) মিলে যায়, অন্যান্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাত্রার মোটিভেশন প্রয়োজন হয়। প্রাইমেট জাতীয় অনেক স্ত্রী সদস্যে যৌনাঙ্গের রং ও স্ফীতি **এস্ট্রাস চক্রকে** প্রকাশ করে। পুরুষ সদস্য তাতে আকৃষ্ট হয়ে জনন সম্পন্ন করে।

প্রাণীর আচরণের প্রকৃতি সংক্ষেপে নিম্নরূপ–

১. আচরণের দ্বারা প্রাণী দ্রুত ও সুবিধাজনক উপায়ে তার পরিবেশের প্রতি সাড়া প্রদান করে।
২. জিন ও পরিবেশ উভয়ের দ্বারাই প্রাণীর আচরণ প্রভাবিত হয়।
৩. প্রাণীর আচরণ প্রজাতি নির্দিষ্ট। একটি নির্দিষ্ট উদ্দীপকের প্রতি সাড়া প্রদানে বিভিন্ন প্রাণি-প্রজাতির মধ্যে বিভিন্নতা দেখা যায়।
৪. প্রাণীর আচরণ **অভিযোজনিক**; কোনো উদ্দীপক চিনে তার প্রতি সাড়া দেয়া প্রতিটি প্রাণীর প্রকৃতিতে টিকে থাকার একটি প্রধান উপায়।
৫. প্রাণীর কিছু আচরণ চক্রাকারে সংঘটিত হয়। এটি দৈনিক, মাসিক, ঋতুভিত্তিক বা বর্ষভিত্তিক হতে পারে। জীবের প্রাত্যহিক চক্রকে **দৈনিক ছন্দোময়তা** (circadian rhythm) বলে যা একটি **জৈবিক ঘড়ি** (biological clock) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
৬. প্রাণীর আচরণে সহজাত ও শিখন উভয় ধরনের উপাদানই থাকে।
৭. প্রাণীর আচরণ উদ্দীপক নির্ভর; নির্দিষ্ট উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দিয়ে প্রাণীরা নির্দিষ্ট আচরণ প্রদর্শন করে।
৮. প্রাণীর আচরণ সাধারণত **মোটিভেশন** (motivation) বা **প্রেষণাজাত**। প্রেষণা হলো প্রয়োজন বা অভাববোধ থেকে সৃষ্ট উদ্দেশ্যমুখী কর্মপ্রচেষ্টা।
৯. প্রাণীর সব ধরনের আচরণের কিছু মূল্য ও সুবিধা থাকে যা অনেক প্রাণীকে সমাজবদ্ধ কিংবা যূথবদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত করে।
১০. মানুষ ব্যতীত অন্যান্য কিছু প্রাণীর আচরণ প্রদর্শনের জন্য জটিল বোধশক্তির প্রয়োজন হয়। এ বোধশক্তি প্রাণীকে সামাজিক জীবনে অভিযোজনের কিছু সুবিধা এনে দেয়।

উদ্দীপনা (Stimulus)

উদ্দীপনা হচ্ছে এক প্রকার সংকেত যা বাণী বহন করে, যাকে শনাক্ত করা যায়। প্রাণীতে আচরণগত পরিবর্তনে এ ধরনের সংকেত সংবেদন সৃষ্টি করে তাই একে **সাংকেতিক উদ্দীপনা** (sign stimulus) বলে। Konrad Lorenz একে নাম দেন Key stimulus। উদ্দীপনা বাহ্যিক অথবা অভ্যন্তরীণ দুটোই হতে পারে। যেমন, মুঠোফোনটি বেজে উঠলে আমরা শব্দ অথবা **কম্পন** (vibration) এর মাধ্যমে তা জানতে পারি– এটি **বহিঃ উদ্দীপনা**। অন্যদিকে, ক্ষিদে পেলে আমাদের দেহে অন্য এক প্রকার উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় যা আমাদের খাদ্য গ্রহণে প্ররোচিত করে। এটি হচ্ছে **অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা**। বাহ্যিক উদ্দীপনা আলো, তাপ, গন্ধ, শব্দ ইত্যাদি। একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে সকল প্রাণী একই ধরনের উদ্দীপনা গ্রহণ করে এমন নয়। যেমন, মানুষের ক্ষেত্রে দর্শন, শ্রবণ, স্বাদ, গন্ধ ও স্পর্শ–এই পাঁচ প্রকার উদ্দীপনা সক্রিয় থাকে। অন্য প্রাণীর ক্ষেত্রে এসব উদ্দীপনা সক্রিয় নাও হতে পারে।

উদ্দীপনায় আচরণগত পরিবর্তন (Behavioural Changes due to Stimulus)

উৎপত্তি ও কাজের ভিত্তিতে সাংকেতিক উদ্দীপনা তিন রকম : মোটিভেশন, রিলিজিং এবং টার্মিনেটিং উদ্দীপনা।

১. মোটিভেশন (Motivation) বা প্রেরণাদায়ক উদ্দীপনা : এ উদ্দীপনা অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক হতে পারে। দিনের সময়কাল বেড়ে গেলে পাখির বিচরণ পরিসীমা রক্ষা ও জনন আচরণ প্রভাবিত হয়। এটি **বাহ্যিক উদ্দীপনা**। অন্যদিকে, শীতযাপনকালে আহার অন্বেষণের ভয়ংকর বাস্তবতার কথা চিন্তা করে দেহে সঞ্চিত চর্বি থেকে শক্তি আহরণ করার বিষয়টি হচ্ছে **অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা**। প্রেরণাদায়ক উদ্দীপনা প্রাণীকে এমন 'তাড়না' বা 'লক্ষ' ('drive' or 'goal') সরবরাহ করে যাতে প্রাণী দ্বিতীয় সাংকেতিক উদ্দীপনা অর্থাৎ রিলিজিং বা নির্গমণ উদ্দীপনা প্রদর্শনে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে।

২. রিলিজিং (Releasing) বা নির্গমণ উদ্দীপনা : **রিলিজার** হচ্ছে একটি সাধারণ উদ্দীপনা। কোনো প্রজাতির এক সদস্য যখন একই প্রজাতির আরেক সদস্যের উদ্দেশে আচরণগত সাড়ার অংশ হিসেবে ক্রমাগত উদ্দীপনার প্রকাশ ঘটায় তখন তাকে **রিলিজার** (releasers) বলে। বিখ্যাত আচরণবিজ্ঞানী **লরেঞ্জ** (Lorenz) **সর্বপ্রথম** Releaser শব্দ প্রয়োগ করেন এবং আরেক পৃথিবীখ্যাত বিজ্ঞানী **টিনবারগেন** (Tinbergen) আচরণে এর ভূমিকা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছেন। **হেরিংগাল** (গাংচিল, *Larus argentatus*)-এর খাদ্য গ্রহণ প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের সময় রিলিজারের কার্যকারিতার বিষয়টি জানা যায়। হেরিংগাল যখন শাবকদের জন্য খাবার নিয়ে আসে শাবক তখন পিতা-মাতার হলদে রংয়ের নিম্নচোয়ালে অবস্থিত একটি লাল ফোঁটায় ঠোকর মেরে মাছ উগরে দেয়ার সংকেত দেয়। উগরে দেয়া মাছ শাবক হেরিংগাল গলাধঃকরণ করে। বিজ্ঞানী টিনবারগেন ও পারডেক (Tinbergen and Perdeck) এ প্রক্রিয়ার রহস্য উদঘাটনে নিয়ন্ত্রিত ও ধারাবাহিক গবেষণা করেন। তাঁরা কাগজের শক্ত বোর্ড দিয়ে পূর্ণবয়স্ক হেরিংগালের মাথা বানিয়ে তাতে ঠোঁটের মধ্যে কড়া বৈসাদৃশ্য প্রদর্শনকারী (contrast) রংয়ের ফোঁটা মেখে লক্ষ করেন যে ঠোঁটের ফোঁটাই খাদ্য চেয়ে আকুতি জানানোর একমাত্র রিলিজার। শুধু তা-ই-নয়, তাঁরা আরও লক্ষ করেন যে পূর্ণবয়স্কের ঠোঁটে একটিমাত্র ফোঁটার বদলে তাঁদের তৈরি একটি দন্ডের মধ্যে দু-তিনটি আড়াআড়ি দাগ দিয়ে শাবকের চোখের সামনে ধরলে সেটাকে আরও বেশি ঠোকারাতে থাকে।

৩. টারমিনেটিং (Terminating) বা সমাপ্তিকরণ উদ্দীপনা : যে উদ্দীপনায় আচরণগত সাড়ার সমাপ্তিকরণ ঘটে তাকে **টারমিনেটিং উদ্দীপনা** বলে। এটি বাহ্যিকও হতে পারে, অভ্যন্তরীণও হতে পারে। পাখির দৃষ্টি উদ্দীপনা (visual stimuli) যখন একটি বাসা নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে মনে করে তখন পাখি বাসা নির্মাণ বন্ধ করে দেয়। এটি হচ্ছে **বাহ্যিক টারমিনেটিং উদ্দীপনা**। অন্যদিকে, ভরপেট না হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ পাকস্থলি ভরে না খাওয়া পর্যন্ত) খাওয়া চালিয়ে যাওয়া, পাকস্থলি পূর্ণ হলে অর্থাৎ পরিতৃপ্তির পর খাওয়া বন্ধ করা হচ্ছে **অন্তঃস্থ টারমিনেটিং উদ্দীপনা**।

আচরণ ও বংশগতির মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Behaviour and Heredity)

মানব ইতিহাসের গোড়ার দিকে DNA-র উত্তরাধিকার কিংবা জিনগত তথ্য থেকে শারীরিক, শারীরবৃত্তিক বা আচরণগত অনুবাদের পদ্ধতি সবকিছু ছিল অজানা। কিন্তু তা সত্ত্বেও আদি মানুষ তাদের স্বতঃলব্ধ জ্ঞান দিয়ে বুঝতে পেরেছে যে উত্তরাধিকার কোনো না কোনোভাবে আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। যৌন মিলন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তারা মানুষের উপকারী পশু-পাখি পোষ মানিয়ে গৃহপালিত করতে পেরেছে। গবাদি পশু, পাখি, কুকুর প্রভৃতির আচরণ দেখলেই বোঝা যাবে প্রাণিগুলো ওদের বন্য পূর্বপুরুষ থেকে কতোখানি ভিন্ন। মানব ইতিহাসে উন্নয়নের ধারার অন্যতম প্রধান উপাদান হচ্ছে নির্বাচনমূলক প্রজনন সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত ও প্রাণী বাছাই বিষয়টি। অথচ উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে পর্যন্ত ডারউইন ও মেন্ডেলের যুগান্তকারী আবিষ্কার ও বর্ণনা প্রকাশের আগে আমরা উন্নত প্রাণী সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়ার মূল রহস্য জানতে পারিনি।

বর্তমান সময়ে খুব সহজেই জানতে পারছি যে, জিন ও পরিবেশ উভয়ই আচরণকে প্রভাবিত করে। আচরণে এ দুই উপাদানের মিথক্রিয়া নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণা অব্যাহত রয়েছে। জিনের প্রভাবে প্রাণীর শারীরিক ও শারীরবৃত্তিক যে

কাঠামো নির্মিত হয় তার ভিতরে পরিবেশের কর্মকান্ডে একেকটি প্রাণিসদস্যে আচরণের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। পরিবেশ প্রাণীর দৈহিক ও শারীরবৃত্তিক পরিস্ফুটনকে প্রভাবিত করতে পারে, সে অনুযায়ী ঐ প্রাণীর আচরণও প্রভাবিত হয়।

জিনগুলো শিক্ষণ, স্মৃতি ও জ্ঞানের এক অস্থায়ী তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলে, প্রাণী তার পরিবেশ উপযোগী আচরণে প্রয়োজনীয় তথ্য এ ভান্ডার থেকে গ্রহণ ও সঞ্চয় করতে পারে। মানুষ শিক্ষণ আচরণের মাধ্যমে অনেক কিছু জেনে বুঝে অর্থাৎ অভিজ্ঞতার আলোকে আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, অন্যদিকে, অনেক প্রাণিপ্রজাতির আচরণ দেখলে মনে হবে স্বয়ংক্রিয় (automatic), অর্থাৎ আগে থেকেই প্রোগ্রাম করা আচরণ। এসব বিষয় বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আচরণ ও বংশগতির মধ্যে সম্পর্কের বিস্তারিত ও জটিল ব্যাখ্যা বেরিয়ে এসেছে। ১৯৬০ সালের আগে প্রাণী আচরণ নিয়ে আচরণবিজ্ঞানীরা দুশিবিরে বিভক্ত ছিলেন: একটি **ইউরোপিয়ান**, অন্যটি **আমেরিকান**। অস্ট্রিয়ান প্রাণিবিজ্ঞানী **কনরাড লরেঞ্জ** (Konred lorenz)-এর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে **আচরণবিদ্যা** (ethology) দিক নির্দেশনা ফিরে পায়। বিজ্ঞানী লরেঞ্জ আচরণগুলোকে প্রধান দুটি ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন একটি **অর্জিত** (acquired), অন্যটি **সহজাত** (innate বা instinct)।

সহজাত আচরণের প্রকাশ ঘটে কোনো প্রাকচিন্তাভাবনা ছাড়াই, তা ছাড়া এ আচরণ শিক্ষণের মাধ্যমে বদলানোরও উপায় নেই। সহজাত আচরণের নমুনা সবার চোখেই পড়েছে। অন্ততঃ অন্ধকার ঘরে হঠাৎ আলো জ্বললে তেলাপোকা যে দ্রুত অন্ধকার কোণে দৌড়ায়- এ ঘটনা কারও নজর এড়িয়েছে বলে মনে হয় না। এমন ছোট-খাট ঘটনা অর্থাৎ নির্দিষ্ট উদ্দীপনায় নির্দিষ্ট সাড়া দেয়ার প্রক্রিয়ায় শিক্ষণের কিছু নেই, সম্পূর্ণ **জিনগত** বিষয় জড়িত। বংশপরম্পরায় এ আচরণের পরিবর্তনও হয় না। অনুরূপভাবে, কোনো প্রজাতির সকল সদস্য একইভাবে সংকেতও প্রদর্শন করে। যে সংকেতটি প্রদর্শিত হয় তা ঐ প্রজাতির সকল সদস্যে একই কারণে এবং একইভাবে প্রকাশিত হয়। এক কুকুরের প্রতি রেগে গেলে আরেক কুকুরের মুখের অভিব্যক্তি, গায়ের লোম খাড়া হয়ে যাওয়া এবং লেজের ভঙ্গি সার্বজনীন। অর্থাৎ বিষয়টি সহজাত। অন্যান্য প্রাণী জিনগত ও শিক্ষণ তথ্যের সমন্বয়ে সংকেত সৃষ্টি করে। পাখিকে যদি অন্য পাখির গান একেবারেই শুনতে না দেওয়া হয় তাহলেও পাখি প্রজাতি-নির্দিষ্ট গানের মতো করে গাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু পরিস্ফুটনকালে নির্দিষ্ট গান শুনতে দিলে পাখিটি প্রজাতি-নির্দিষ্ট গান নিখুঁত গাইতে পারবে। অর্থাৎ সহজাত আচরণ সব সময় গাঁথুনি হিসেবে কাজ করে।

অর্জিত–সহজাত বিভাজনে (acquired - innate dichotomy) যে বিষয়টি অস্পষ্ট তা হচ্ছে প্রাণীর শিক্ষণ তখনই সম্ভব যখন সে যথারীতি নির্দিষ্ট পথে নিজ আচরণের উৎকর্ষ ঘটাতে জিন-নিয়ন্ত্রিত হয়ে পরিচালিত হয়। একটি প্রাণীর শিক্ষণ ভাল হতে পারে কিন্তু কোন অভিজ্ঞতা নিজের আচরণের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় তা নির্ভর করে প্রাণীর পূর্বপুরুষের জিনগত নির্দিষ্ট সাফল্যের উপর। অন্যদিকে, একটি প্রাণী জীবদ্দশায় যত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এবং সে অভিজ্ঞতা প্রাণীর জিনকে যেভাবে সক্রিয় করে তা পরবর্তীতে প্রাণীর আচরণ নির্ধারণে ভূমিকা রাখে। আধুনিক আচরণবিজ্ঞানীরা অর্জিত বনাম সহজাত আচরণকে অত্যন্ত সাদামাটা চোখে দেখে থাকেন। তাঁদের ধারণা, কোনো আচরণই শতভাগ অর্জিত নয়, বা সহজাতও নয়। বরং সমস্ত আচরণই হচ্ছে জিন ও পরিবেশের এক জটিল মিথস্ক্রিয়া।

প্রাণী আচরণে বিবর্তন এমনভাবে কাজ করেছে যেন জিন ও পরিবেশ পরিপূরক হয়ে কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব রক্ষায় যেসব সংকটের মুখোমুখি হয় তার আচরণগত সমাধান বের করতে পারে। সহজাত সাড়া প্রাণীকে আচরণের উপর বংশ পরম্পরায় প্রাকৃতিক নির্বাচন থেকে প্রাপ্ত উপকার পাওয়ার সুযোগ করে দেয়। শিক্ষণের মাধ্যমে প্রাণী এমন হাতিয়ার অর্জন করে যার সাহায্যে সে স্থানীয় অবস্থা ও পরিবর্তনশীল পরিবেশে সাড়া দিতে সক্ষম হয়। মানুষের আচরণ নির্ধারণে জিন ও পরিবেশের আপেক্ষিক ভূমিকা প্রকাশিত হওয়ায় সৃষ্টি হয়েছে মতভিন্নতা। তা সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা উপসংহার টানছেন এ কথা বলে যে আচরণ হচ্ছে বিবর্তনিক প্রক্রিয়ার ফল যা কখনও জেনেটিক কোডিং-এর মাধ্যমে প্রাণীর জন্য আচরণগত নির্দেশনা সৃষ্টি করে, কখনওবা এমন নমনীয় কৌশল উদ্ভাবন করে যাতে প্রাণী তার নিজস্ব পরিবেশে উদ্ভূত সমস্যা নিজের সমাধান করতে পারে।

সহজাত আচরণ (Innate behavior)

সহজাত আচরণ হচ্ছে এমন আচরণ যা জন্মগত পাওয়া অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাপ্ত ও সুনির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনকারী আচরণ। পরিবেশের হঠাৎ পরিবর্তনে প্রজাতির অস্তিত্ব বাঁচাতে সাড়া হিসেবে এ আচরণের প্রকাশ ঘটে। একটি প্রজাতির সকল সদস্যে সহজাত আচরণ এক রকম হয়। যেমন- তরুণ বা বয়স্ক সব বয়সের বাবুই পাখি ডিমপাড়ার সময় হলে যে সুনিপুণ কারিগরি জ্ঞানে বাসা বুনে সেটি সহজাত আচরণ। এ আচরণ বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হয়।

সহজাত আচরণের বৈশিষ্ট্য : (i) এটি জিন নিয়ন্ত্রিত, বংশগত আচরণ; একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি প্রাণীর জন্য এ আচরণ সুনির্দিষ্ট। (ii) এ আচরণ শিক্ষণের মাধ্যমে বা পূর্ব অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিচালিত হয় না। (iii) এ আচরণ বংশানুক্রমে একইভাবে চলতে থাকে। মাকড়সার জাল বুনন, পাখির বাসা তৈরি বংশানুক্রমে একইভাবে চলে আসছে। (iv) এ আচরণ জন্মগত; কোনো কোনো প্রাণীতে জন্মের পরই এ আচরণ প্রকাশ পায়। যেমন–জন্মের পরই শাবকের মাতৃস্তন দুগ্ধ পান করা। আবার অনেক প্রাণীতে পরিপক্কতার মধ্যদিয়ে তার আচরণ প্রকাশ পায়। যেমন–সঙ্গী নির্বাচন, পাখির বাসা তৈরি, ডিমে তা দেয়া ইত্যাদি। (v) কোনো না কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রাণীরা এ আচরণ করে থাকে যদিও উদ্দেশের ফলাফল সম্পর্কে প্রাণীর কোনো পূর্ব ধারণা থাকে না। (vi) সহজাত আচরণের সঙ্গে বুদ্ধির কোনো সম্পর্ক নেই। (vii) এ আচরণ প্রাণীর জৈবিক প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করে, আত্মরক্ষা, বংশরক্ষা ও অন্যান্য কাজে সহায়তা দান করে।

সহজাত আচরণের উদাহরণঃ ট্যাক্সিস, প্রতিবর্ত ক্রিয়া, স্বভাবজাত আচরণ

১. চলন আচরণ বা ট্যাক্সিস (Taxis)

উপযুক্ত পরিবেশে জীবন যাপনের জন্য প্রাণীরা সংবেদী অঙ্গ ও স্নায়ুতন্ত্রের যৌথ প্রক্রিয়ায় দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালনের মাধ্যমে চলন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। এটি প্রাণিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং একটি সরল অভিযোজিত আচরণ। কিন্তু যখন বাইরের উদ্দীপকের প্রভাবে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সক্রিয় সঞ্চালনের মাধ্যমে প্রাণিদের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ প্রাণীরা স্থানান্তরিত হয় তখন তাকে **ট্যাক্সিস** (taxis, গ্রিক *taeksi* = arrangement বা বিন্যাস; বহুবচনে, taxes) বলে। এতে সংবেদী অঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং প্রাণীর দিক পরিবর্তন নির্দিষ্ট উদ্দীপকের ওপর নির্ভরশীল।

ট্যাক্সিসের সাধারণ বৈশিষ্ট্য : (i) এ চলন শিক্ষালব্ধ আচরণ নয়। (ii) এটি বাহ্যিক উদ্দীপক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। (iii) এতে উদ্দীপকের উৎসের সাথে সম্পর্ক রেখে প্রাণীর দেহের অবস্থানগত পরিবর্তন ঘটে। (iv) এ চলনে সংবেদী অঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। (v) এক্ষেত্রে উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া পজেটিভ অথবা নেগেটিভ হতে পারে। (vi) এটি যেহেতু শিক্ষালব্ধ আচরণ নয় সেহেতু এটি জীবের আচরণে রূপান্তরিত হতে পারে না, আবার একে জীব নিজেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। (vii) এ চলন ক্রিয়ার গতি দ্রুত। (viii) কেবল মাত্র সচল প্রাণীতে এরূপ চলন পরিলক্ষিত হয়।

ট্যাক্সিসের প্রকারভেদ : বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে সাড়াদানের ভিত্তিতে ট্যাক্সিসের প্রকারভেদ করা হয়ে থাকে, যেমন– উদ্দীপনার উৎস, উদ্দীপনার বিষয়, সংবেদী অঙ্গের উপস্থিতি ইত্যাদি। প্রাণীর অবস্থান পরিবর্তন সব সময় উদ্দীপকের উৎসের সাথে নির্দিষ্ট কোণে সম্পাদিত হয় বা সরাসরি উৎসের দিকে কিংবা উৎস থেকে দূরে সরে যায়।

দেহের দিকমুখিতার ভিত্তিতে ট্যাক্সিস নিম্নোক্ত দুরকম–

১. পজিটিভ বা ধনাত্মক ট্যাক্সিস (Positive taxis) : এক্ষেত্রে প্রাণী উদ্দীপকের উৎসের দিকে ঘুরে যায় বা গমন করে।

২. নেগেটিভ বা ঋণাত্মক ট্যাক্সিস (Negetive taxis) : এক্ষেত্রে প্রাণী উদ্দীপকের উৎস থেকে দূরে সরে যায়।

উদ্দীপনার উৎসের ভিত্তিতে জীবে নিম্নোক্ত বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্সিস দেখা যায়–

100%

১. ফটোট্যাক্সিস (Phototaxis) : আলোক উদ্দীপকের প্রতি প্রাণীর প্রতিক্রিয়া। উদাহরণ– আলোর প্রতি ঘাসফড়িংয়ের ধনাত্মক ও আরশোলার ঋণাত্মক ফটোট্যাক্সিস।

২. থার্মোট্যাক্সিস (Thermotaxis) : তাপ উদ্দীপকের প্রতি প্রাণীর প্রতিক্রিয়া। উদাহরণ– গ্রীষ্মকালে অধিকমাত্রায় মশার প্রকোপ, ছারপোকার আক্রমণ ধনাত্মক এবং ব্যাঙের শীতনিদ্রা ঋণাত্মক থার্মোট্যাক্সিস।

৩. হাইড্রোট্যাক্সিস (Hydrotaxis) : পানির প্রতি প্রাণীর প্রতিক্রিয়া। উদাহরণ– কেঁচোর ভেজা মাটিতে বসবাস **ধনাত্মক** হাইড্রোট্যাক্সিস।

৪. কেমোট্যাক্সিস (Chemotaxis) : বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের প্রতি প্রাণীর প্রতিক্রিয়া। উদাহরণ– চিনির প্রতি পিঁপড়ার আকর্ষণ **ধনাত্মক** ও কার্বলিক এসিড থেকে সাপের দূরে থাকা **ঋণাত্মক** কেমোট্যাক্সিস।

৫. জিওট্যাক্সিস (Geotaxis) : মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রতি প্রাণীর সাড়া। উদাহরণ–বিভিন্ন ধরনের পোকার গাছ বেয়ে উপরে উঠা ও পিউপা (pupa) তৈরির সময় নিচের দিকে নামা **ধনাত্মক** ও **ঋণাত্মক** জিওট্যাক্সিস।

৬. থিগমোট্যাক্সিস (Thigmotaxis) : স্পর্শানুভূতির প্রতি প্রাণীর প্রতিক্রিয়া। উদাহরণ–চলাচলের সময় তেলাপোকা তার অ্যান্টেনার মাধ্যমে ক্ষতিকর কোনোকিছুর সংস্পর্শে এলে দ্রুত পলায়ন করে যা **ঋণাত্মক** থিগমোট্যাক্সিস।

৭. রিওট্যাক্সিস (Reotaxis) : প্রবাহমান পানির প্রতি প্রাণীর সাড়া। উদাহরণ– মাছের পোনার স্রোতমুখী চলন **ধনাত্মক** রিওট্যাক্সিস। প্রজনন ঋতুতে ইলিশ মাছেরা স্রোতের উজানে এসে ডিম পাড়ে যা **ঋণাত্মক** রিওট্যাক্সিস।

৮. গ্যালভানোট্যাক্সিস (Galvanotaxis) : বিদ্যুৎ প্রবাহের প্রতি প্রাণীর সাড়া। উদাহরণ– জলাধারে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালনায় অ্যামিবার অ্যানোড (+) হতে ক্যাথোড (−) প্রান্তের গমন **ঋণাত্মক** গ্যালভানোট্যাক্সিস।

৯. সনো/ফনোট্যাক্সিস (Sono/Phonotaxis) : শব্দের প্রতি প্রাণীর প্রতিক্রিয়া। উদাহরণ পানিতে শব্দ হলে কিছু মাছ **ধনাত্মক** ও কিছু মাছ **ঋণাত্মক** সনোট্যাক্সিস দেখায়।

১০. অ্যানিমোট্যাক্সিস (Anemotaxis) : বায়ু প্রবাহের প্রতি প্রাণীর সাড়া। উদাহরণ– বায়ু প্রবাহের অনুকূলে ও প্রতিকূলে পাখির উড়া **ধনাত্মক** ও **ঋণাত্মক** অ্যানিমোট্যাক্সিস।

১১. স্টেরোট্যাক্সিস (Sterotaxis) : মসৃণ ও সমতল তলের প্রতি প্রাণীর সাড়া। উদাহরণ–দেয়াল টিকটিকির দেয়ালে চলাচল **ধনাত্মক** এবং বন টিকটিকির বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়ানো **ঋণাত্মক** স্টেরোট্যাক্সিস।

১২. সাপেক্ষ ট্যাক্সিস (Conditional taxis) : যখন কোনো প্রাণী একই সময়ে দুই বা ততোধিক ট্যাক্সিস প্রদর্শন করে তখন তাকে **সাপেক্ষ ট্যাক্সিস** বলে। যেমন- কিছু প্রজাপতি ডিম পাড়ার জন্য বিশেষ উদ্ভিদের গন্ধ ও সবুজ পাতার দিকে গমন করে।

ট্যাক্সিসের দিকমুখিতার ভিত্তিতে আচরণ নিম্নোক্ত ৫ রকম–

১. ক্লাইনোট্যাক্সিস (Klinotaxis) : যেসব প্রাণীতে এ ট্যাক্সিস ঘটে সেসব প্রাণীতে কোনো জোড় সংবেদ অঙ্গ থাকে না, বরং সংবেদগ্রাহী কোষগুলো সমগ্র দেহ জুড়ে, বিশেষ করে সম্মুখ অংশে অবস্থান করে। সম্মুখ অংশটি এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে উদ্দীপনার ব্যাপকতা যাচাই করে। সবদিক থেকে ব্যাপকতার সমতা এলে প্রাণী সোজা চলতে শুরু করে। ব্লোফ্লাই (blowfly) ও বাটারফ্লাই (butterfly)-এর লার্ভায় এ ধরনের ট্যাক্সিস দেখা যায়।

২. মেনোট্যাক্সিস (Menotaxis) : এ ধরনের ট্যাক্সিসে প্রাণীর দিকমুখিতা থাকে কৌণিক (angular) ধরনের। যেমন–সূর্যের প্রতি সাড়া দিয়ে পিঁপড়ার চলন।

৩. নেমোট্যাক্সিস (Mnemotaxis; Gk, *mneme* = স্মৃতি) : এটি কোনো প্রাণীর স্মৃতিমূলক সাড়াদান। এসব প্রাণী কোথাও গেলে চলার পথের আশ-পাশের কোনো বস্তুকে চিহ্ন হিসেবে মনে রাখে, ফেরার সময় ওই চিহ্নগুলো মনে করে ফিরে আসে। দুএকটা স্মৃতিচিহ্ন উঠিয়ে নিলে প্রাণীর বাসায় ফেরা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৪. টেলোট্যাক্সিস (Telotaxis) : এটি হচ্ছে শক্তিশালী উদ্দীপকের প্রতি সাড়াদান। এ ক্ষেত্রে প্রাণিদেহে জোড় সংবেদ অঙ্গ থাকে। একটি মৌমাছি যখন খাদ্যের খোঁজে চাক থেকে বের হয় তখন একদিকে সূর্য, অন্যদিকে ফুল-এ দুটি উদ্দীপক থাকে। এ দুই উদ্দীপকের মধ্যে ফুল-এর উদ্দীপনা বেশি হওয়ায় মৌমাছি ফুলে গিয়ে বসে, ভারসাম্য বজায় রেখে মধ্যপথে অগ্রসর হয় না।

৫. ট্রোপোট্যাক্সিস (Tropotaxis) : এটি হচ্ছে দুই বা ততোধিক সংবেদগ্রাহী অঙ্গে একটি উদ্দীপকের উদ্দীপনা একসঙ্গে গৃহীত হলে ভারসাম্যমূলক ট্যাক্সিস। এক্ষেত্রে প্রাণিদেহে জোড় সংবেদঅঙ্গ উপস্থিত থাকে। মাছের উকুনে (fish louse) এ ধরনের ট্যাক্সিস দেখা যায়।

ট্যাক্সিসের অভিযোজনিক গুরুত্ব

ট্যাক্সিসের অভিযোজনিক গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন–প্রজাপতির দিকমুখিতা ও চলন শত্রুর হাত থেকে বাঁচাতে সাহায্য করে; পিঁপড়া ও পাখির বাসায় ফেরার বিষয়টি ট্যাক্সিসের নিয়মে পরিচালিত হয়; এবং ঋণাত্মক ফটোট্যাক্সিসের ফলে মাছির লার্ভা অন্ধকার কোণে পিউপায় রূপান্তরিত হওয়ার সুযোগ পায়। এক কথায় বলতে গেলে, উদ্দীপনায় যথাসময়ে সঠিক সাড়া দিয়ে প্রাণী বংশবৃদ্ধি থেকে শুরু করে নীড় নির্মাণ, অপত্য যত্ন, আহার সংগ্রহ, শত্রুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে নির্বংশ হওয়া থেকে টিকে থাকে।

২. প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex action)

মস্তিষ্ক হচ্ছে দেহের সকল কাজ নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র। দেহের কোনো অংশে মশা বসলে **সংবেদী স্নায়ু** (sensory nerve) দিয়ে সেই সংবাদ মস্তিষ্কে পৌঁছে। মস্তিষ্ক তখন **চেষ্টীয় স্নায়ু** (motor nerve) দিয়ে হাতের পেশিকে নির্দেশ প্রদান করে, ফলে আমরা হাতটি সরিয়ে নিই অথবা মশাকে মারতে চেষ্টা করি। কিন্তু অনেক সময় কোনো জরুরি প্রয়োজনে এ নির্দেশ মস্তিষ্কের পরিবর্তে **সুষুম্না কাণ্ড** বা **স্পাইনাল কর্ড** (spinal cord) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন– তীব্র আলোতে চোখের পাতা দুটি তাৎক্ষণিতভাবে বন্ধ হয়ে যায়, গরম ইস্ত্রিতে হাত পড়লে চট করে হাত দূরে সরে যায়। এসব জরুরি প্রক্রিয়াগুলো অনৈচ্ছিক এবং স্পাইনাল কর্ড দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। এ প্রক্রিয়াগুলো হলো **প্রতিবর্ত ক্রিয়া**। ঘুমন্ত অবস্থায় মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে, ঐ সময় মশা কামড়ালে আমরা হাত, পা সরিয়ে নেই। এগুলো স্পাইনাল কর্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং এটিও এক রকম প্রতিবর্ত ক্রিয়া। **কোন উদ্দীপকের প্রভাবে মস্তিষ্কের নির্দেশ ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে পেশি বা কোন অঙ্গে যে অনৈচ্ছিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তাকে প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলে**। প্রতিবর্ত ক্রিয়া সুষুম্না কাণ্ডের নিয়ন্ত্রণে **প্রতিবর্ত চক্র** নামক এক বিশেষ সংক্ষিপ্ত স্নায়ু পথ দিয়ে ঘটে থাকে।

প্রতিবর্ত ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য : (i) সাধারণত অধিকাংশ প্রতিবর্ত ক্রিয়াই সরল প্রকৃতির, কারণ একটি উদ্দীপকের প্রয়োগ দ্বারা মাত্র একটি প্রতিক্রিয়া ঘটে। (ii) এ ক্রিয়া অনৈচ্ছিক, স্বয়ংক্রিয় (autonomic) এবং সহজাত (innate) বা জন্মগত। (iii) এর পিছনে কোন পূর্ব পরিকল্পনা থাকেনা। (iv) লক্ষ বা পরিনাম চিন্তার দ্বারাও এটি পরিচালিত হয় না। (v) কোনোরূপ পরিবর্তন ছাড়াই এর পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে, তাই এটি স্টেরিওটাইপ (stereotype) ধরনের আচরণ। (vi) এ ক্রিয়া প্রাণীর আত্মরক্ষাসহ অন্যান্য কাজে (আকস্মিক দুর্ঘটনা, মস্তিষ্কের অতিরিক্ত কাজের চাপ ইত্যাদি) সহায়ক ভূমিকা পালন করে। (vii) প্রতিবর্ত ক্রিয়া খুব দ্রুত গতিতে বা স্বল্পতম সময়ে সম্পন্ন হয়। (viii) যে উদ্দীপকের কারণে প্রতিবর্ত ক্রিয়া শুরু হয়, সেই উদ্দীপক ক্রিয়াশীল থাকা পর্যন্ত এর কার্যক্রম চালু থাকে। (ix) এ ক্রিয়া সহজে সংশোধিত বা পরিবর্তিত হয়না। (x) উদ্দীপক দ্বারা সার্বক্ষণিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার প্রয়োজন হয় না।

প্রতিবর্ত চক্র (Reflex Cycle)

প্রতিবর্ত ক্রিয়ার স্নায়ুর উদ্দীপনা যে পথে সংঘটিত হয় তাকে প্রতিবর্ত চক্র (reflex arc) **বলে**। এ চক্র পাঁচটি অংশ নিয়ে গঠিত।

১. **একটি গ্রাহক (Receptor) :** এটি সংবেদী উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।

২. **অন্তর্বাহী পথ (Afferent path) :** এটি একটি সংবেদী স্নায়ু যা গ্রাহক অঙ্গ থেকে উদ্দীপনা কেন্দ্রিয় স্নায়ুতন্ত্রে বহন করে নিয়ে যায়।

৩. **কেন্দ্র (Center) :** এটি প্রকৃতপক্ষে সুষুম্না কান্ডে অবস্থিত একটি **সিন্যাপস** যার মাধ্যমে অন্তর্বাহী স্নায়ুর উদ্দীপনা চেষ্টীয় নিউরনে পরিবাহিত হয়।

৪. **বহির্বাহী পথ (Efferent path) :** এটি একটি চেষ্টীয় স্নায়ু। এর মাধ্যমে বহির্গামী স্নায়ু উদ্দীপনা কেন্দ্র থেকে প্রভাবিত অঙ্গে প্রেরিত হয়।

৫. **প্রভাবিত অঙ্গ (Effector organ) :** এটি একটি **পেশি** বা একটি **গ্রন্থি** হতে পারে যা যথাক্রমে সঙ্কোচন বা নিঃসরণের মাধ্যমে প্রতিবর্ত ক্রিয়ার প্রভাব প্রদর্শন করে।

প্রতিবর্ত ক্রিয়া সংঘটন পদ্ধতি : প্রতিবর্ত ক্রিয়া সংঘটন পদ্ধতি একটি উদাহরণের মাধ্যমে দেখানো হলো।

অসতর্কভাবে সেলাই করার সময় হঠাৎ আঙুলে সূঁচ ফুটলে, কিংবা গরম পাত্রে হাত লাগলে তাৎক্ষণিকভাবে হাত ক্ষিপ্রতার সাথে অন্যত্র নিরাপদ স্থানে সরে যায়। এটি একটি **পলিসিন্যাপটিক প্রতিবর্ত ক্রিয়া** যা নিম্নরূপে সংঘটিত হয়:

ধাপ-১ : গরম পাত্রে বা আগুনে হাত লাগলে আঙুলের ত্বকে অবস্থিত সংবেদী নিউরনের ডেনড্রাইটসমূহ ব্যথার অনুভূতির উদ্দীপনা গ্রহণ করে। এখানে গ্রাহক বা ত্বক **রিসেপ্টর অঙ্গ** হিসেবে কাজ করে।

ধাপ-২ : আঙুলের ত্বক থেকে উদ্দীপনা সংবেদী নিউরনের অ্যাক্সনের মাধ্যমে সুষুম্না কান্ডের গ্রে ম্যাটার অংশে পৌছায়।

ধাপ-৩ : সুষুম্না কাণ্ডের গ্রে ম্যাটার অংশে অবস্থিত সংবেদী নিউরনের অ্যাক্সন ও রিলে নিউরনের ডেনড্রাইটের মধ্যবর্তী সিন্যাপস এর মধ্য দিয়ে তড়িৎ রাসায়নিক পদ্ধতিতে (electrochemical process) উদ্দীপনা চেষ্টীয় নিউরনের ডেনড্রাইটে প্রবেশ করে এবং অ্যাক্সন কর্তৃক পরিবাহিত হয়ে আঙুলের বা বাহুর পেশিতে পৌছে।

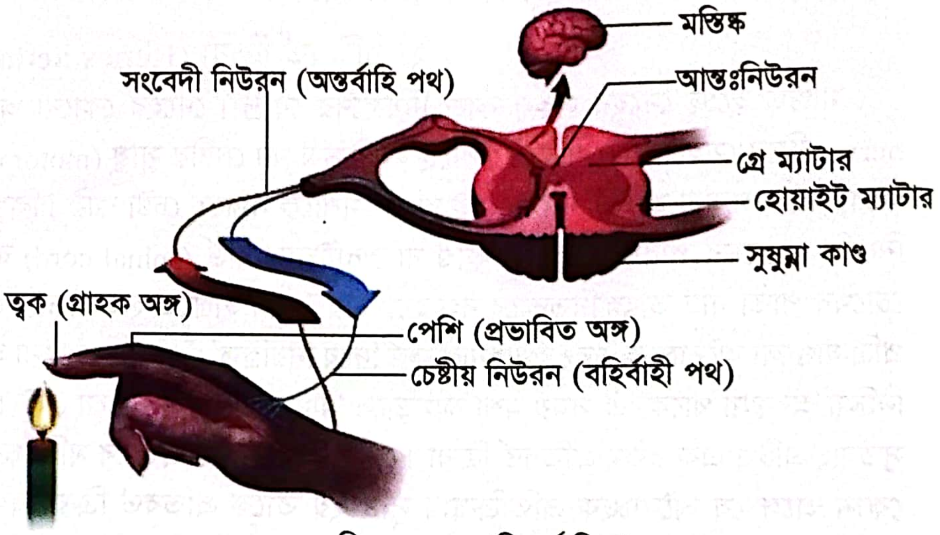

চিত্র ১২.১ : প্রতিবর্ত ক্রিয়া

ধাপ-৪ : স্নায়ু উদ্দীপনা পেশিতে পৌছালে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের নির্দেশে পেশি বা প্রভাবিত অঙ্গের (effector organs) সঙ্কোচন ঘটে। ফলে উদ্দীপনার স্থান থেকে সম্পূর্ণ অনৈচ্ছিকভাবে হাত সরে যায়। এভাবে একটি **সরল প্রতিবর্ত চক্র** সম্পন্ন হয় এবং **প্রতিবর্ত ক্রিয়া** সম্পাদিত হয়।

প্রতিবর্ত ক্রিয়ার প্রকারভেদ

বিখ্যাত সোভিয়েত বিজ্ঞানী **আইভান প্যাভলভ** (Ivan Pavlov) প্রতিবর্ত ক্রিয়াকে দুটি ভাগে ভাগ করেন।

১. সহজাত প্রতিবর্ত ক্রিয়া বা আনকন্ডিশন্ড রিফ্লেক্স ও ২. অর্জিত বা সাপেক্ষ বা কন্ডিশন্ড রিফ্লেক্স।

১. সহজাত বা আনকন্ডিশন্ড রিফ্লেক্স (Unconditioned Reflex) : যেসব প্রতিবর্ত ক্রিয়া জন্মগত, স্থির এবং কোনো শর্তাধীন নয় তাদের **সহজাত প্রতিবর্ত ক্রিয়া** বলে। যেমন- (i) খাবার দেখলে বা খাবারের গন্ধে লালা নিঃসৃত হওয়া, (ii) উজ্জ্বল আলোতে চোখের পিউপিলের সঙ্কুচিত হওয়া, (iii) হাতে বা পায়ে গরম স্যাঁক বা কাঁটার খোঁচা লাগলে সাথে সাথে হাত বা পা সরিয়ে নেয়া ইত্যাদি।

সহজাত প্রতিবর্ত আবার তিন প্রকার। যথা–

i. উপরিগত বা সুপারফিসিয়াল প্রতিবর্ত **(Superficial Reflex) :** এক্ষেত্রে উদ্দীপনা ত্বক থেকে গৃহীত হয়। পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিলে পায়ের পাতা সঙ্কুচিত হয়। এটি সুপারফিশিয়াল প্রতিবর্তের উদাহরণ।

ii. গভীর বা ডিপ প্রতিবর্ত **(Deep Reflex) :** এক্ষেত্রে উদ্দীপনা দেহের গভীরে অবস্থিত **টেনডন** (tendon) থেকে গৃহীত; ফলে টেনডন সংলগ্ন পেশি সঙ্কুচিত হয়। পা ঝুলিয়ে বসে হাঁটুতে মৃদু আঘাত করলে হাঁটুতে ঝাঁকুনির সৃষ্টি হয়। এটি ডিপ প্রতিবর্তের উদাহরণ।

iii. আন্তরযন্ত্রীয় বা ভিসেরাল প্রতিবর্ত **(Visceral Reflex) :** এধরনের প্রতিবর্ত ক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় (autonomic) এবং দেহের আন্তরযন্ত্রসমূহ থেকে উৎপন্ন হয়। যেমন–হৃৎপিন্ড, পাকস্থলি, অন্ত্র, ফুসফুস, মূত্রাশয় ইত্যাদির প্রতিবর্ত।

২. অর্জিত বা কনডিশন্ড রিফ্লেক্স (Conditioned Reflex) : যেসব প্রতিবর্ত ক্রিয়া জন্মগত নয়, বার বার অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত হয় এবং শর্তসাপেক্ষ, তাদের **অর্জিত বা কনডিশন্ড রিফ্লেক্স** বলে।

উল্লিখিত প্রধান দুধরনের ছাড়া আরও এক ধরনের প্রতিবর্ত ক্রিয়া দেখা যায় যা মূলত: একাধিক প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সমষ্টি। যেমন– কোনো ঝাঁঝালো গন্ধে হাঁচি আসে এবং তার সাথে সাথে চোখে পানি আসে। এক্ষেত্রে দুটি প্রতিবর্ত ক্রিয়া পরপর সংঘটিত হয়েছে বলে একে **ক্রমিক প্রতিবর্ত ক্রিয়া** (chained reflex) বলে।

৩. সহজাত বা স্বভাবজাত আচরণ বা ইনসটিংক্টস (Instincts)

সাগর পাড়ে সর্বোচ্চ জোয়ার থেকেও খানিকটা দূরে যে সামুদ্রিক কাছিম ডিম পেড়ে বালু দিয়ে ঢেকে রেখে যায় তা থেকে দুমাসের মাথায় ডিম ফুটে কাছিমের বাচ্চা ফুটে অন্য কোনো দিকে না গিয়ে সোজা সমুদ্রের পানিতে আশ্রয় নেয়। পৃথিবীর সব সামুদ্রিক কাছিমের বাচ্চাই এ কাজ করে। বাচ্চাটাকে কেউ যদি সমুদ্রবিমুখে ঘুরিয়ে দেয় তাহলে খানিকটা থমকে আবার ঘুরে সাগরপানে ছুটে যায়। সাগরপানে ছুটে যেতে কাছিমের বাচ্চাকে কেউ নির্দেশ দেয়নি, বরং এটি জিনগতভাবে স্থায়ী ও বংশগত আচরণ। জন্মগত যে শক্তির সাহায্যে একটি প্রজাতির সকল সদস্য কোনো শিক্ষণ ছাড়া এবং উদ্দেশ্য ও ফলাফল সম্বন্ধে অবহিত না থেকে আত্মরক্ষা ও প্রজাতিরক্ষায় বংশপরম্পরায় একইভাবে কাজ করে থাকে, সেটাই **ইনসটিংক্ট**।

আগে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, ইনসটিংক্ট হচ্ছে নিসর্গ পরিচালিত এক শক্তি। **ডারউইন** (১৮৫৯) সর্বপ্রথম ইনসটিংক্টের বাস্তবমুখি একটি সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁর সংজ্ঞা অনুযায়ী, প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে গড়ে উঠা এক জটিল প্রতিবর্তী। ডারউইনের সংজ্ঞায় প্রচ্ছন্নভাবে হলেও এ বক্তব্যটি উঠে এসেছে যে উত্তরাধিকার সূত্রের মাধ্যমে আগত সাড়াদানের প্রক্রিয়ায় ইনসটিংক্টের প্রকাশ ঘটে।

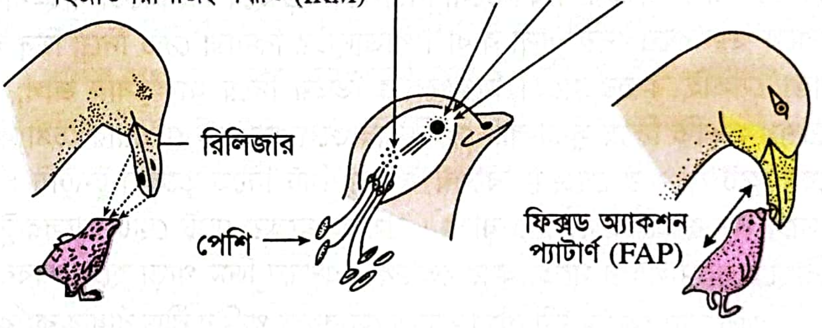

চিত্র ১২.২ : রিলিজারের সঙ্গে IRM ও FAP-এর সম্পর্ক

লরেঞ্জ (Lorenz, 1937) ডারউইনের বক্তব্য মেনে নিলেও কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করে বলেন যে প্রত্যেক প্রাণি-প্রজাতির আচরণ কতকগুলো **স্থায়ী** (বা অপরিবর্তনীয়) **অ্যাকশন প্যাটার্ণ** (Fixed Action Pattern, FAP) নিয়ে গঠিত, আর এগুলো হচ্ছে প্রজাতি-নির্দিষ্ট, অতএব জিনগতভাবে নির্ধারিত (genetically determined)। লরেঞ্জ আরও বলেছেন যে প্রতিটি FAP-ই ইনসটিংক্ট এবং প্রাণিদেহে অনেক ইনসটিংক্ট কেন্দ্র রয়েছে। **টিনবারগেন** (Tinbergen, 1951) লরেঞ্জ প্রদত্ত ধারণাকে সামগ্রিকভাবে সমর্থন জানিয়েছেন।

যা হোক, সদ্যজাত **হেরিংগাল** ও তার মায়ের মধ্যে যে **সাড়া** (response) প্রদর্শিত হয় তা থেকে ইনসটিংক্টের সুন্দর ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। ক্ষুধার্ত হেরিংগাল ছানা চাক্ষুষ উদ্দীপনার প্রতি সংবেদনশীল। অন্যদিকে, বাসায় ছানার উপস্থিতি পূর্ণাঙ্গ হেরিংগাল-এ **চাক্ষুষ উদ্দীপনা** (visual stimuli) হিসেবে কাজ করে। রিলিজিং উদ্দীপনার মাধ্যমে যে বার্তার সৃষ্টি হয় তা অপটিক স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের একটি কেন্দ্রে বাহিত হয়। এ কেন্দ্রই সুনির্দিষ্ট বার্তার প্রতি নির্দিষ্ট সাড়া দেয়। এ প্রক্রিয়াটি **সহজাত রিলিজিং পদ্ধতি** (Innate Releasing Mechanism, IRM)। IRM নির্দিষ্ট পেশিকে সঙ্কোচন ও প্রসারণের নির্দেশ দেয়। ফলে ছানার ঠোকর পড়ে পূর্ণাঙ্গ হেরিংগাল-এর ঠোঁটে অবস্থিত লাল ফোঁটার উপর। এটাই হচ্ছে **স্থায়ী অ্যাকশন প্যাটার্ণ** (FAP)।

100%

FAP এর বৈশিষ্ট্য

বিশ্বখ্যাত আচরণবিজ্ঞানী লরেঞ্জ (১৯৩২) প্রদত্ত মানদন্ড অনুযায়ী একটি FAP-কে অবশ্যই নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হতে হবে।

১. ছাঁচসম্মত (Stereotypy) : আচরণ সব সময় একই রকম হবে।
২. সার্বজনীনতা (Universality) : একটি প্রজাতির সকল সদস্যে এ আচরণ প্রদর্শিত হবে।
৩. ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বহির্ভূত (Independence of individual experience) : বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকলেও প্রজাতির সব সদস্যে একই আচরণ প্রকাশিত হবে।
৪. ব্যালিসটিকনেস (Ballisticness) : সাড়া একবার দেয়া হলে পরিস্থিতির পরিবর্তন সাপেক্ষেও তা অপরিবর্তিত থাকে।
৫. উদ্দেশ্যের একনিষ্ঠতা (Singleness of purpose) : একটিমাত্র কাজ করে।

টুনটুনি পাখির বাসা নির্মাণ

টুনটুনি পাখির বাসা বাঁধা ইনসটিংক্টের এক চমৎকার উদাহরণ। এক লম্বালেজি তরুণী টুনটুনি সঙ্গী নির্ধারণ শেষে তার প্রথম নীড় বাঁধার কাজে সক্রিয় হয়। বেশ কয়েকটি গাছ ঘুরে খুঁজে দেখে কোথায় দুটি বড় ঝুলন্ত পাতা রয়েছে যেখানে বাসা বাঁধলে শাবকগুলো নিরাপদে বড় হবে। মনমতো গাছ-পাতা-জায়গা পেলে শুরু করে দেয় বাসা বাঁধা। পাতাদুটির কিনারা ঠোঁট দিয়ে ছিদ্র করে চটের বস্তা সেলাই করার মতো ছিদ্রগুলোর ভিতর দিয়ে মাকড়সার জাল, ককুন-এর রেশম প্রভৃতি দিয়ে সুতা বানিয়ে কিনারাগুলো আটকে দেওয়ার চেষ্টা করে। সুতা যেন ছুটে না যায় সেজন্য বিশেষ উপায়ে গিঁট দিতে ভুলেনা টুনটুনি। টেনে-টুনে দেখে থলির মতো গড়নের বাসা। বাসার মেঝেয় ছোট ছোট ডালের টুকরা, ঘাস বিছিয়ে নরম গদির মতো করে তোলে। এখানে ডিম পাড়া হবে, শাবক পালিত হবে।

চিত্র ১২.৩ : টুনটুনির বাসা নির্মাণ

প্রথমবার যে টুনটুনি বাসা বানায় সে বয়স্ক পাখির নীড় বাঁধার কর্মকান্ড বা কৌশল সম্বন্ধে কিছুই জানে না। তা সত্ত্বেও যে বাসাটি বাঁধে সেটি নিখুঁত না হলেও শাবক লালনে চলনসই গণ্য হয়।

টুনটুনি পাখির বাসা বাঁধার প্রক্রিয়া একটি ইনসটিংক্টিভ আচরণের সুলভ ও যথাযথ উদাহরণ।

প্রতিবর্ত ক্রিয়া ও সহজাত আচরণের পার্থক্য

প্রতিবর্ত ক্রিয়া	সহজাত আচরণ
১. মেরুদণ্ডীদের ক্ষেত্রে এ ক্রিয়া স্নায়ুরজ্জু (nerve cord) কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।	১. এটি মস্তিষ্ক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।
২. এটি সরল প্রকৃতির এবং সুনির্দিষ্ট উদ্দীপকের প্রতি তাৎক্ষণিক দ্রুতগতিতে সাড়া দেয়।	২. এটি জটিল প্রকৃতির এবং ধীর গতিতে বিকশিত হয়।
৩. এটি অনেকসময় প্রাণীর ইচ্ছানুযায়ী নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তন করা যায়।	৩. এটি কখনোই প্রাণীর ইচ্ছানুযায়ী নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তন করা যায় না।
৪. প্রতিবর্ত ক্রিয়া বুদ্ধিপ্রসূত নয়।	৪. সহজাত আচরণের মধ্যে বুদ্ধির ছাপ সুস্পষ্ট।
৫. প্রতিবর্ত ক্রিয়া যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হওয়ায় এর কাজ সর্বক্ষেত্রে একই রকম এবং এটি অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিবর্তিত হয় না।	৫. এটি অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিবর্তিত হয়।
৬. প্রতিবর্ত ক্রিয়া আত্মরক্ষামূলক।	৬. এটি আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষামূলক আচরণ।
৭. জৈবনিক সব প্রয়োজন মেটাতে অপরিহার্য নয়।	৭. জৈবনিক সব প্রয়োজন মেটাতে এটি অপরিহার্য।

সহজাত আচরণ যাচাই

আগেই বলা হয়েছে যে সহজাত আচরণ বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়। এ কথার সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় পরিযায়ী পাখিদের নির্দিষ্ট ঋতুতে বংশপরম্পরায় একই বিচরণ ভূমিতে সাময়িক ফিরে আসার মধ্য দিয়ে। পৃথিবীর অতিবিপন্ন (Critically Endangered, CR) একটি পাখি হচ্ছে চামচঠোঁটি কাদাখোচা (Spoon-billed Sandpiper, Eurynorhynchus pygmeus)। এটি প্রতিবছর নির্দিষ্ট সময়ে বাংলাদেশের উপকূলীয় দ্বীপাঞ্চলে আহার, আশ্রয় ও নিরাপত্তার জন্য রাশিয়া থেকে পরিযায়ী হয়। পরিযায়ী পাখি সহজাত আচরণকে কাজে লাগিয়ে বুঝে নেয় কোন সময় ও কোন পথে পরিযায়ী হতে হবে এবং এখানে এসে হাওর-বাওর-নদী ফেলে উপকূলীয় কাদাময় দ্বীপে হেঁটে হেঁটে আহার খুঁজতে হবে–এসব কর্মকান্ড সহজাত আচরণের বহিঃপ্রকাশ। পেটপুরে খেয়েদেয়ে নির্দিষ্ট সময়ে পুনরায় স্থায়ী বাসস্থানে ফিরে যাওয়ার মধ্য দিয়ে এদের বাংলাদেশ সফরের সমাপ্তি ঘটে।

শীতের পাখির মাইগ্রেশন বা পরিযান

প্রত্যেক প্রাণীর জন্যই পরিবেশে কিছু না কিছু প্রতিকূল বিষয় থাকে। এসব বিষয় অনেক সময় ঋতুভিত্তিক দেখা দেয়। ঋতুগতভাবে পরিবর্তনশীল পরিবেশ মোকাবিলায় প্রাণী যে সব কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে তারই একটি হচ্ছে **মাইগ্রেশন** (migration) বা **পরিযান**। প্রাণী তখন অনুকূল পরিবেশের উদ্দেশে যাত্রা করে। প্রকৃত অর্থে পরিযান বলতে উভয়মুখি চলাচলকে বুঝায় অর্থাৎ স্থায়ী বাসভূমি থেকে নতুন কোনো অনুকূল পরিবেশে যাত্রা এবং সেখানে সাময়িক বসবাসের পর পুনরায় স্থায়ী বসতিতে প্রত্যাগমন। এরকম যাতায়াত সাধারণত একই পথ অনুসরণ করে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে সংঘটিত হয়। পাখির পরিযান এধরনের। পাখির জগতে পরিযান ব্যাপক বিস্তৃত। প্যালিআর্কটিক অঞ্চলের ৪০ শতাংশ পাখি-প্রজাতি পরিযায়ী। পাখিদের পরিযান বিজ্ঞানীদের কাছে আজও রহস্যাবৃত ঘটনা, তবে যে কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ উল্লিখিত হয়েছে তা হচ্ছে–খাদ্যের স্বল্পতা, শীতের তীব্রতা, পূর্বপুরুষীয় বাসভূমিতে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি।

স্থানীয় পরিযান সাধারণত কয়েকশ ফুট থেকে ১-২ মাইল পর্যন্ত হয়, যেমন-হিমালয়ান পার্ট্রিজ (একধরনের তিতির)। অন্যদিকে, আর্কটিক টার্ণ ১১ হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে শীতকালে অ্যান্টার্কটিকার উপকূলে এসে হাজির হয়। কিছু পাখি মাটির সামান্য উপর দিয়ে উড়ে গেলেও সুশৃঙ্খল পরিযানের অংশগ্রহণকারী পাখি মাটি থেকে প্রায় ৩ হাজার থেকে ২০ হাজার ফুট উচ্চকায় আন্দিজ ও হিমালয় পর্বতকেও অতিক্রম করে যায়। পাখিরা সাধারণত একদিনে ৫ - ৬ ঘন্টা উড়বার পর খাদ্য ও পানীয়ের জন্য বিশ্রাম নেয়, কিন্তু গোল্ডেন পোভার পাখির বিরতিহীনভাবে উড়ে ১৪০০ মাইল দূরবর্তী দক্ষিণ আমেরিকায় পৌঁছার প্রমাণ আছে। পরিযানের সময় পাখিরা সুশৃঙ্খল রীতি মেনে চলে। প্রথমে বয়স্ক পাখিরা পরিযায়ী হতে শুরু করে, পরে স্ত্রী ও তরুণরা অনুসরণ করে। ফিরতি অভিযানে তরুণরাই নেতৃত্ব দেয় বলে জানা গেছে। পরিযানের নিয়ম ও সময় সবসময় ঠিক থাকে। অস্বাভাবিক আবহাওয়ায় কিছুটা ব্যতিক্রম না ঘটলে কিছু প্রজাতির পরিযান-সময় ও শীতভূমি পরিত্যাগ-সময় বছরের পর বছর প্রায় একই থাকে, দুএকদিন এদিক-ওদিক হতে পারে। তা ছাড়া, পাখিরা সবসময় একই পথ ধরে পরিযায়ী হয় এবং ঠিক আগের জায়গায় গিয়ে পৌঁছে।

পরিযানের গমনপথ : পরিযায়ী পাখিরা নিজস্ব গমনপথ ধরে এগিয়ে চলে। এ পথ অনেক সময় একই থাকে। পাখির বিভিন্ন গমন পথের মধ্যে রয়েছে সমুদ্র, উপকূলীয় নদী ও নদী-বিধৌত ভূখন্ড ও পার্বত্য পথ। সমুদ্র পথ সাধারণত সামুদ্রিক পাখিরা ব্যবহার করে। কিছু স্থলচর পাখি সমুদ্র পথে ৪০০ মাইল পর্যন্ত অতিক্রম করে যায়, কিন্তু মধ্যবর্তী কোন স্থানে দ্বীপ থাকলে তারা আরও বেশি পথ অতিক্রম করতে পারে। বিশেষ করে জলচর পাখিরা উপকূলীয় পথ ধরে পরিযায়ী হয়। সমতল থেকে পাহাড়ে এবং পাহাড় থেকে সমতলে গমনাগমনের সময় পরিযায়ী পাখি নদী ও নদীবিধৌত ভূখন্ডকে গমনপথ হিসেবে বেছে নেয়। এশিয়ার বড় নদীগুলো পরিযানের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। খুব কম পাখিই পর্বত অতিক্রম করে। পর্বতগুলো পরিযায়ী পাখিদের নির্দেশক চিহ্ন হিসেবে কাজ করে, তবে কিছু জলচর পাখিতে হিমালয় পর্বত অতিক্রম করতেও দেখা যায়। ঐ পাখিদের জন্য এটি একটি গমন পথ।

পরিযানের গুরুত্ব

উপকারী ভূমিকা : মাইগ্রেশনের ফলে পাখি আবহাওয়ার প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা পায়; বিচিত্র ও পর্যাপ্ত আহার পায় এবং পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা হ্রাস পায়; গ্রীষ্মে স্বদেশ ভূমিতে এসে উপযোগী ও নিষ্কন্টক জনন ক্ষেত্র ফিরে পায়, কম কষ্টে পর্যাপ্ত আহার পায়, তখন পাখি সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে। বিভিন্ন প্রজাতির মিলনে জিন সংযুক্তির সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

অপকারী ভূমিকা : মাইগ্রেশন পাখির জন্য বেশ বিরূপ প্রভাব ফেলে, যেমন– অনেক সময় বিরতিহীন ভ্রমণে ক্লান্ত অসংখ্য পাখি সমুদ্রে পড়ে মারা যায়; আবহাওয়ার আকস্মিক পরিবর্তনে, যেমন- প্রবল বর্ষণ, তুষারপাত ও ঝড়ে পড়ে বিপুল সংখ্যক পরিযায়ী পাখি মৃত্যুবরণ করে; তরুণ পাখিরা দূর পরবাসে অনেক প্রাকৃতিক শত্রুর মুখোমুখি হয়; বৈদ্যুতিক তার ও লাইট হাউজ ছাড়াও অগণিত পাখি মানুষের শিকারে পরিণত হয়; এবং মানুষের শিকারে পরিণত হয়ে অকালে প্রাণ হারায়।

বাংলাদেশের পরিযায়ী পাখি

বাংলাদেশ প্রধানত শীতকালে পরিযায়ী পাখির আগমনে মুখরিত থাকে। সারা বছরই পরিযায়ী পাখির আনাগোনা অব্যাহত থাকে। এসব পাখি দেশের পাখি হতে পারে, আবার বিদেশিও হতে পারে। সময়কাল ভেদে এগুলো **গ্রীষ্মকালীন** ও **শীতকালীন** পাখি নামে পরিচিত। কিছু পাখি আছে যা অন্যদেশে যাওয়ার আগে দুএকদিন বাংলাদেশে অবস্থান করার পর নির্দিষ্ট দেশে উড়াল দেয়। এসব পাখি **ট্রানসিয়েন্ট পরিযায়ী**।

বাংলাদেশে যে সব বিদেশি পাখি পরিযায়ী হয় তার বেশির ভাগ আসে হিমালয় ও তার বাইরে থেকে। অনেক প্রজাতির আগমন ঘটে ইউরোপ ও দূরপ্রাচ্য (যেমন সাইবেরিয়া) থেকে। অর্থাৎ ইউরেশিয়া থেকে দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এশিয়ায় শীতে পাখি পরিযায়ী হয়। শরৎ ও বসন্তকালেও কিছু পাখির যাতায়াত চোখে পড়ে। আর দেশি পাখির পরিযান সারা বছরই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হতে থাকে। বাংলাদেশের প্রায় **৫০০ প্রজাতির স্থায়ী পাখি** রয়েছে, অস্থায়ী বা **বিদেশি পাখি প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৩০০**। অনেক বিদেশি পরিযায়ী পাখি রয়েছে যা স্বদেশে বিপন্ন বা অতিবিপন্ন হয়ে আছে এমন পাখিও বাংলাদেশে এসে কিছু দিনের জন্যে হলেও স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়ে যায় (যেমন-Spoon-billed Sandpiper)। বাংলাদেশে হাঁস, রাজহাঁসসহ বিভিন্ন প্রজাতির জলচর পাখিসহ অসংখ্য শিকারি পাখিও (চিল, বাজ) পরিযায়ী হয়। এসব পাখি দেশের বড় বড় হাওড়, নদী ও উপকূল জুড়ে বিস্তৃত থাকে। লক্ষ লক্ষ সদস্যের দৃশ্যমান পরিযায়ী পাখির পাশাপাশি অদৃশ্য পতঙ্গভুক্ত পাখিরা বন-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। অক্টোবর-মার্চ মাস পর্যন্ত মাইগ্রেটরি পাখি দেখার ধুম পড়ে যায়। সমস্ত হাওর এলাকা পরিযায়ী পাখির জন্য সংরক্ষিত ঘোষণা করা হয়েছে, আইনে বিশেষ বিধান করে এগুলো সুরক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উপসংহার : পাখি প্রকৃতির এক অপূর্ব সৃষ্টি। এদের পরিযান হচ্ছে একদিকে প্রাণিজগতের অন্যতম সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ, অন্যদিকে, অন্যতম রহস্যময় ঘটনা। শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষ তা অবলোকন করেছে, নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছে। একবিংশ শতাব্দীতেও এর রহস্য উন্মোচন করা সম্ভব হয়নি। কিসের আশায় ও কিসের নেশায় পাখি পরিযায়ী হয়, প্রাকৃতিক নির্বাচনের সেই নিগূঢ় রহস্য উন্মোচন করতে পারলে হয়তো মানব প্রজাতিও তা কাজে লাগাতে পারবে।

মাকড়শার জাল (Spider Web)

মাকড়শার বৃত্তাকার জালক হচ্ছে অতি জটিল ও অপরিবর্তনীয় আচরণগত প্যাটার্ণের ফলশ্রুতি। মাকড়শার অস্তিত্ব রক্ষায় এ জাল মূল ভূমিকা পালন করে। জালটি উড়ন্ত শিকার ধরার ফাঁদ হিসেবে কাজ করে, জালের সুতার উপর দিয়ে দ্রুত গতিতে মাকড়শা নিজে দৌড়াতে পারে।

মাকড়শা বৃত্তের জাল বোনে রেশমি সুতা দিয়ে। উদরীয় বিশেষ সিল্ক গ্রন্থি (silk glands) থেকে ক্ষরিত পদার্থকে শতশত অণুনালিকাযুক্ত তিনজোড়া বুননকারী (spinnerets)-র মাধ্যমে সুতা নির্মাণ করা হয়। সিল্ক গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত স্ক্লেরোপ্রোটিন (scleroprotein) থেকে সৃষ্ট সুতা বাতাসের সংস্পর্শে এসে শক্ত রেশমি সুতায় পরিণত হয়। একই ব্যাসের ইস্পাতের সুতা অপেক্ষা মাকড়শার সুতা বেশি শক্তিশালী। টান দিয়ে ছিঁড়তে গেলে ছেঁড়ার আগে এ সুতা এক-পঞ্চমাংশ পর্যন্ত লম্বা হতে পারে।

সারা পৃথিবীতেই মাকড়শা জাল বোনে, সময় লাগে আধ ঘন্টারও কম। মাঠে যেসব মাকড়শা বাস করে তাদের অধিকাংশই খুব ভোরে সুর্যোদয়ের সময় জাল বোনে। জালিকা বৃত্ত একটি নিয়ত গঠন– এতে রয়েছে কাঠামো frame), অরীয় স্পোক (radial spokes) এবং আঠাল প্যাঁচ (viscid spirals)। হ্যান্স পিটার্স (Hans Peters, 1939) সর্বপ্রথম মাকড়শার জাল বোনার ধাপ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন।

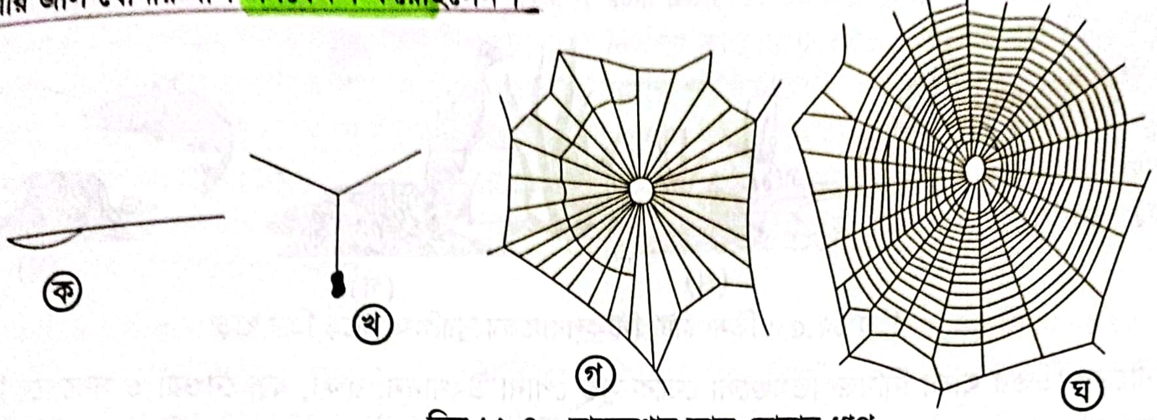

চিত্র ১২.৪ : মাকড়শার জাল বোনার ধাপ

মাকড়শার জাল বোনার শুরুতে একটি Y-আকৃতির ভারা (রাজ মজুরদের ভারা) নির্মাণ করে, এরপর কাঠামো ও অরীয় স্পোক, এবং সবশেষে অন-আঠাল ও আঠাল প্যাঁচ সৃষ্টি করে। প্রত্যেক ধাপে সৃষ্ট জালকগুলো সঠিক কোণ ও দূরত্ব অনুসরণ করে নির্মিত হয়। এভাবে নিখুঁত কৌণিক বৃত্তাকার জাল নির্মাণ মাকড়শার সহজাত আচরণের অন্যতম উদাহরণ।

অপত্যের প্রতি যত্ন– মাছ, ব্যাঙ, পাখি (Parental Care—Fish, Toad, Bird)

ডিমপাড়া বা সন্তান ধারণ করা থেকে শুরু করে এদের লালন পালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ মাতা বা পিতা কিংবা উভয়ের সহজাত আচরণ। **শিশুর জন্মলাভ ও তাদের স্বনির্ভর হওয়া পর্যন্ত পিতামাতা কর্তৃক পরিচর্যা নেয়াকে অপত্যের প্রতি যত্ন-নেয়া বা Parental care বলে।** মাছ, উভচর, পাখি, স্তন্যপায়ী প্রাণীতে এরূপ আচরণ লক্ষ করা যায়।

মাছের অপত্য যত্ন

প্রাণী আচরণ গবেষণায় **তিন-কাঁটা স্টিকলব্যাক** (Three-spined stickleback, *Gastrosteus aculeatus*) মাছের গুরুত্ব অনেক। এ মাছের বিস্তৃতি দক্ষিণে কৃষ্ণ সাগর (Black sea), দক্ষিণ ইতালি, আইবেরিয়ান পেনিনস্যুলা, উত্তর আফ্রিকা, পূর্ব এশিয়ায় জাপানের উত্তর অংশে, উত্তর আমেরিকা এবং গ্রীনল্যান্ডে। আচরণবিদ্যার অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ মাছের আচরণের উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে। প্রখ্যাত আচরণবিজ্ঞানী **টিনবারগেন** (Tinbergen) তিন-কাঁটা স্টিকলব্যাকের উপর গবেষণা করেছেন। তাঁর গবেষণার ভিত্তিতে এ মাছের অপত্যের প্রতি যত্নের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো।

এক থেকে তিন বছর বয়সে তিন-কাঁটা স্টিকলব্যাক পরিণত (mature) হয়। জননকাল ছাড়া অন্য সময়ে ঝাঁকবদ্ধ হয়ে বাস করে। বসন্তকালে অর্থাৎ জননকালে পরিণত স্টিকলব্যাকেরা দলহীন হয়ে উপকূলবর্তী অগভীর পানির জলাশয়ে নিজস্ব বিচরণ পরিসীমা নির্ধারণ করে সর্তক পাহারায় নিযুক্ত থাকে। কারও অনুপ্রবেশে হানাহানি না করে বিভিন্ন শারীরিক কসরত ও বর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়ে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেয়। বিচরণ পরিসীমা প্রতিষ্ঠার পর সেখানে বাসা নির্মাণ শুরু করে। বাসা নির্মাণে শুধু পুরুষ সদস্যই কাজ করে। বাসা নির্মাণের জন্য নির্ধারিত জায়গার তলদেশ থেকে মুখভর্তি বালু তুলে প্রায় ১৫ সেন্টিমিটার দূরে নিক্ষেপ করে। এভাবে একটি অগভীর গর্তের সৃষ্টি হলে পুরুষ মাছ সূত্রাকার শৈবাল ও অন্য জলজ উদ্ভিদ, নুড়ি ও অন্যান্য ধ্বংসাবশেষ জড়ো করে বৃক্ক থেকে ক্ষরিত এক ধরনের প্রোটিনজাত আঠালো পদার্থে আটকে দেয়। সকল তিন-কাঁটা স্টিকলব্যাকের বাসার নির্মাণশৈলী এক হয় না, স্বতন্ত্র রুচির বিষয় মাছের বেলায়ও প্রযোজ্য। কোন কাঠামো কোন স্ত্রী মাছের পছন্দ হবে তারও ব্যাপার আছে। যা হোক, বাসাটি দুমুখ খোলা, মধ্যভাগ ফাঁকা ও সামান্য চওড়া ধরনের।

বাসা নির্মাণ শেষ হলে পুরুষ মাছ উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় স্ত্রী মাছকে আকৃষ্ট করে বাসায় ঢুকিয়ে লেজটাকে ধাক্কা দিয়ে ডিম পাড়তে উদ্বুদ্ধ করে। ডিম পাড়া শেষ হলে পুরুষ মাছ অতিদ্রুত বাসায় প্রবেশ করে ডিমগুলোকে নিষিক্ত করে। একটি বাসায় দু-তিনটি স্ত্রীমাছ ডিম পাড়তে পারে। এরপর পুরুষ মাছটি পিতা ও মাতা উভয়ের ভূমিকা পালন করে ডিমের দেখা শোনা আরম্ভ করে।

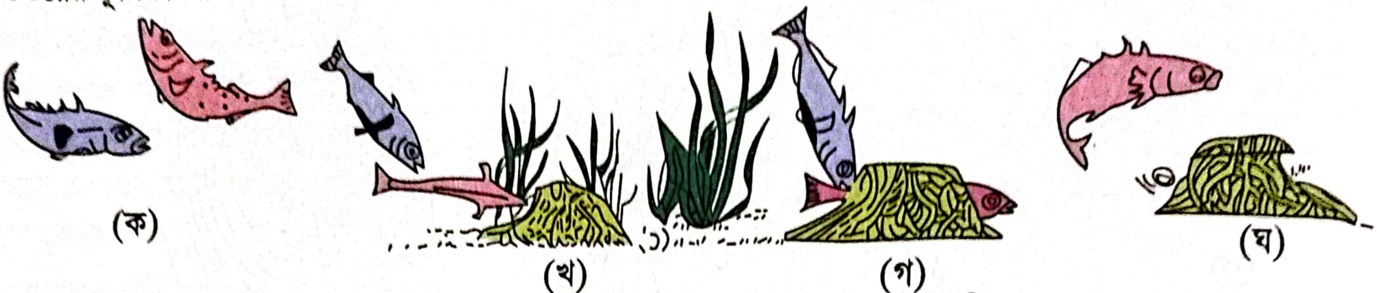

চিত্র ১২.৫ : তিন কাঁটা স্টিকলব্যাকের সুরক্ষিত নীড়ে ডিম ছাড়া

নীড় ও নীড়ের ভিতর থাকা নিষিক্ত ডিমগুলো থেকে সুস্থ পোনা উৎপাদন, রক্ষা, যত্ন নেওয়া ও সবশেষে নিরাপদে পরিবেশে ফিরে যাওয়া অনুকূলে রাখতে পুরুষ মাছ সদাব্যস্ত থাকে। এ সময় বাসার কাছে নিজ প্রজাতির সদস্যসহ কোনো মাছ বা ক্ষতিকর প্রাণীর প্রবেশ রোধ করতে মাছ সদা তৎপর থাকে। ডিম ফোটার অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখার জন্য স্টিকলব্যাক এক অদ্ভুত আচরণ করে। বাসায় প্রবেশ পথের সামনে মাথা নিচু করে তীর্যকভাবে অবস্থান নিয়ে বক্ষপাখনা সামনের দিকে সঞ্চালিত করে। এভাবে অক্সিজেন চাহিদা নিশ্চিত করতে পানিস্রোত অব্যাহত রাখে। এ প্রক্রিয়ার নাম ফ্যানিং (fanning)।

সাত-আটদিনের মধ্যে ডিম ফুটে পোনা বেরিয়ে বাসা ত্যাগ করতে শুরু করলে ফ্যানিং বন্ধ করে দেয়। পোনাগুলো পাহারা দেওয়ার সময় স্টিকলব্যাক আক্রমণাত্মক হয়ে উঠে। পোনার দল অটুট রাখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কোনো কারণে দলের কিছু পোনা দলছুট হলে পুরুষ মাছটি দ্রুত সেগুলোকে মুখে তুলে এনে মূলদলে ছেড়ে দেয়। দুসপ্তাহ পর পোনা দলবদ্ধ চলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এ পর্যায়ে অতিযত্ন ও সতর্কতার মধ্যে রেখে বড় করে তোলা ভবিষ্যৎ বংশধরগুলোকে ছেড়ে নিজের পূর্ণবয়স্ক ঝাঁকে ফিরে যায়।

ব্যাঙের অপত্য যত্ন

ভবিষ্যৎ বংশধরের পরিস্ফুটন যেন নির্বিঘ্ন হয় সে উদ্দেশে সর্তক-সযত্নে বাসা নির্মাণ করে ডিম পাড়া কিংবা সদ্য পরিস্ফুটিত বংশধর বেড়ে না উঠা পর্যন্ত পিতা-মাতার যে কোনো একজন বা উভয়কেই সঙ্গে থাকাকে **অপত্য যত্ন** বলে। অপত্য যত্ন অন্যতম সহজাত প্রবৃত্তি যা প্রায় সব প্রাণিগোষ্ঠীতেই কম-বেশি দেখা যায়। উভচরেও বিচিত্র অপত্য যত্নের পরিচয় পাওয়া যায়, বিশেষ করে গ্রীষ্মমন্ডলীয় উভচরে এমন যত্নের উদাহরণ বেশি। উভচরের অপত্য যত্নকে প্রধান দুটি শিরোনামের অধীনে বর্ণনা করা হয়: (ক) বাসা, আঁতুরঘর বা আশ্রয় নির্মাণের মাধ্যমে যত্ন এবং (খ) ডিম বা লার্ভা পরিবহনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ যত্ন।

নিচে গ্রেডিয়েটর ব্যাঙ নামে পরিচিত দক্ষিণ আমেরিকার (*Hypsiboas rosenbergi*) গেছো ব্যাঙের অপত্য যত্নের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

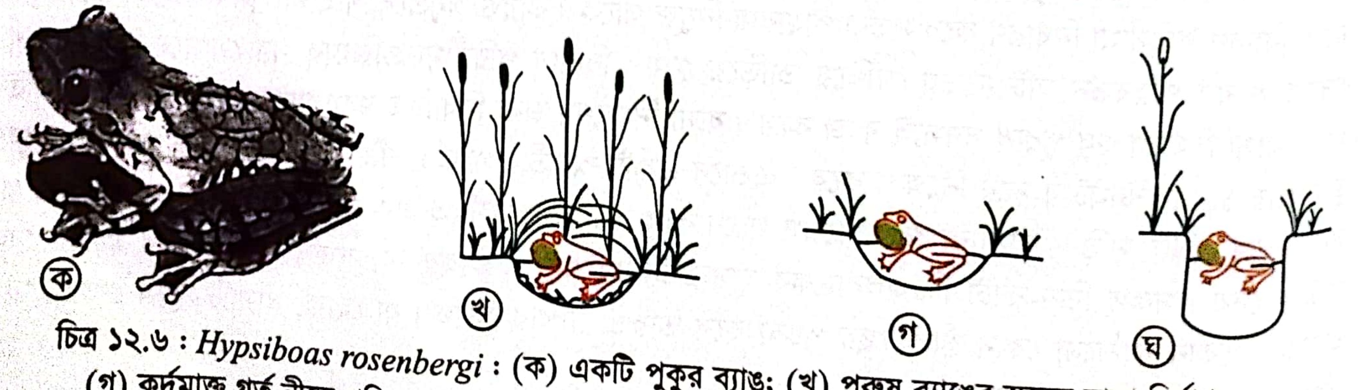

চিত্র ১২.৬ : *Hypsiboas rosenbergi* : (ক) একটি পুকুর ব্যাঙ; (খ) পুরুষ ব্যাঙের স্বহস্তে বাসা নির্মাণ; (গ) কর্দমাক্ত গর্ত নীড়ে পরিণত; (ঘ) গবাদি পশুর পায়ের চাপে কর্দমাক্ত গর্তকে নীড়ে পরিণত করা।

কাদা-মাটির নীড় (mud-nest) নির্মাণ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষার উদ্দেশে বসতির আশেপাশে পুকুর, ডোবা বা এ ধরনের স্থায়ী জলার পাড়ে বাসা বানিয়ে ডিম পাড়ে। জননকালে পুরুষ ব্যাঙ এমন এক জায়গা বেছে নেয় যাতে গর্তখোঁড়া সহজ হয়, নির্মাণ কাজ রাতারাতি সম্পন্ন হয়। বাসা নির্মাণ, সে বাসা স্ত্রী ব্যাঙের পছন্দ হওয়া এবং নিরাপত্তা বিধান সবকিছু মাথায় রেখে স্ত্রী ব্যাঙ ডিম পাড়ে। অতএব বাসা নির্মাণকে প্রাধান্য দিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত সময় কাটাতে হয় পুরুষ ব্যাঙকে। এ ক্ষেত্রে পুরুষ ব্যাঙ তিন উপায়ে বাসা নির্মাণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রথমত সে নিজেই বাসা বানায়; দ্বিতীয়ত পানি ভর্তি অগভীর গর্তকে সামান্য মেরামত করে বাসায় পরিণত করে; এবং তৃতীয়ত অন্য এক পুরুষ ব্যাঙের নির্মিত বাসা দখল করে নেয়। এখানে আলোচ্য গ্লেডিয়েটর পুরুষ ব্যাঙ সাধারণত বেলে বা কাদামাটিতে আগে থেকে কোনো কারণে সৃষ্টি হওয়া গর্তকে দ্রুত বাসা বানিয়ে ফেলে। আগের জনন ঋতুতে ব্যবহৃত বাসাকে ডিম পাড়ার উপযোগী করেও কাজে লাগাতে পারে। গবাদি পশু হেঁটে গেলে জলার কিনারে যে গর্ত হয় সেটাকেও একটু বড়সড় ও মসৃণ করে ডিম পাড়ার উপযোগী করে নিতে পারে।

পুরুষ ব্যাঙ গর্ত খুঁড়তে গিয়ে এমনভাবে মাটি সরায় যাতে মাটি স্তুপাকারে পড়ে গেলে উঁচু কিনারার রূপ নেয়। গর্তের ব্যাস প্রায় ১২-৩৭২ সেন্টিমিটার, আর ৫-৭ সেন্টিমিটার গভীর। তিরিশ মিনিট থেকে কয়েক ঘন্টার মধ্যে বাসা নির্মাণ সমাপ্ত হয়। বাসা নির্মাণ সম্পন্ন হলে পুরুষ ব্যাঙের ডাকে স্ত্রী ব্যাঙ সাড়া দিলেও বাসা ঘুরে-ফিরে দেখে পছন্দ হলে তবেই ডিম ছাড়তে উদ্যত হয়। ডিম ফুটে লার্ভা নির্গত হলে ওদের যেন কোনো অসুবিধা না হয়, নিরাপত্তা বজায় থাকে সবদিক বিবেচনা করে স্ত্রী ব্যাঙ সিদ্ধান্ত নেয়। ডিম ছাড়ার পর এলাকাভেদে পুরুষ ব্যাঙ তার বংশ রক্ষায় তৎপর থাকে। যেখানে বাসা তৈরির জায়গা কম কিন্তু পুরুষ ব্যাঙের সংখ্যা বেশি থাকে সে সব জায়গায় আগ্রাসী বা সন্ত্রাসী পুরুষ ব্যাঙ অন্য ব্যাঙের বাসা দখল করে স্ত্রী ব্যাঙকে ডিম ছাড়তে উদ্বুদ্ধ করে। অবস্থা বুঝে পুরুষ ব্যাঙ শক্ত হাতে বাসা রক্ষা করে। লার্ভা তরুণ ব্যাঙে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত গর্তের পাশে থেকে পাহারা দেয়।

গ্লেডিয়েটর ব্যাঙে মার্চ-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জননকাল হিসেবে পরিচিত। স্ত্রী ব্যাঙ উপযুক্ত বাসায় ১০ মিনিটের মধ্যে প্রায় তিন হাজার ডিম ছাড়ে। দুই তিন দিনের মধ্যে ডিম ফুটে লার্ভা নির্গত হয়। চল্লিশ দিনের মধ্যে এদের রূপান্তর ঘটে।

পাখির অপত্য যত্ন

পাখিমাত্রই অপত্য যত্নে সমৃদ্ধ প্রাণী। সুস্পষ্ট ও সুশৃঙ্খল অপত্য যত্নে পাখি একটি বৈশিষ্ট্যমন্ডিত প্রাণিগোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃত। কোনো প্রাণীর জনন সাফল্য নির্ভর করে সুস্থ-সবল সন্তানকে প্রকৃতির বুকে স্বাবলম্বী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। অন্যদিকে, বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান বিষয় হচ্ছে প্রত্যেকটি প্রাণী সম্বন্ধে তার বাস্তুগত ও প্রজননিক যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা রাখা। এখানে ছোট পানকৌড়ি সংক্ষেপে **পানকৌড়ি** (Little cormorant, *Phalacrocorax niger*) পাখির অপত্য যত্নের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

বাংলাদেশে পানকৌড়ির জননকাল মে-অক্টোবর। তবে জুলাই-আগস্ট মাসে নীড় বাঁধার হার সবচেয়ে বেশি হয়। জননকালে এদের গায়ের ও মুখমন্ডলের পালকের রংয়ে পার্থক্য দেখা দেয়। পানকৌড়িরা যেখানে বাসা বাঁধে সেখানে ছোট বক (Egretta garzetta) ও কানি বক (Ardeola grayii)-ও বাসা বাঁধে। প্রধানত আম ও বট গাছ, সঙ্গে কড়ই, শেওড়া গাছেও বাসা বাঁধে। পানির ধারে ও সহজে মানুষের হাতের নাগালে পাওয়া যায় না এমন উচ্চতায় (৬–১০ মিটার) বিভিন্ন গাছের খড়কুটা দিয়ে অর্থাৎ বাসা বাঁধার জায়গার আশেপাশে যে সব খড়কুটা পাওয়া যায় তা দিয়ে জোড়ের উভয় সদস্য বাসা বাঁধে। বাসার গড় ব্যাস প্রায় ১৫ সে.মি., গভীরতা প্রায় ৫.৫ সে.মি.। দলবেঁধে বাসা বানানোয় অন্য কোনো ক্ষতিকর প্রাণী সহজে কাছে যাওয়ার সাহস পায় না। কাছে গেলেও সমবেত চিৎকারে পালিয়ে যায়। পাঁচ থেকে এগারো দিনের মধ্যে বাসা বাঁধা শেষ হলে পানকৌড়ি একদিন পর পর ২–৬ টি সাদা বা নীলচে-সাদা ডিম পাড়ে। তবে প্রথম ডিম পাড়ার পর পরই ডিমে তা দিতে শুরু করে। স্ত্রী-পুরুষ উভয় সদস্যই তা দেয়ার কাজ ভাগাভাগি করে নেয়। দু'তিন সপ্তাহের মধ্যে ডিম ফুটে শাবক বেরিয়ে আসে।

পানকৌড়ি শান্তশিষ্ট পাখি। দলবদ্ধ থাকায় শিকারী পাখির হামলা প্রতিরোধ সহজ হয়। কিন্তু দুরন্ত কিশোরদের মোকাবিলা করা সম্ভব হয় না। ডিম ও শাবক নষ্ট হওয়ার প্রধানতম কারণ হচ্ছে খেলাচ্ছলে বা ঘরে পোষার জন্য শাবক চুরি, আর খাওয়ার জন্যে ডিম চুরি। প্রচন্ড ঝড়-তুফানেও ডিম ও শাবকের ক্ষতি হয়। এ প্রতিকূল পরিবেশেও শাবকদের যত্ন নেওয়ার কাজে স্ত্রী-পুরুষ উভয় পাখি যথাসাধ্য সচেষ্ট থাকে। শুধু তাই নয়, শাবকের শরীর প্রথম সাত দিন একেবারে

নগ্ন থাকে। শরীরের সংবেদনশীল ত্বক যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে জন্য বাসা নির্মাণের মাল-মসলার মধ্যে সরু আঁশ, শুকনো পাতা ইত্যাদি থাকে, সে সঙ্গে চলে বিরামহীন শাবকগুলোকে আগলে রাখার চেষ্টা করা। রাতে সারাক্ষণ স্ত্রী পাখি বাসায় বসে থাকে, পুরুষ পাখি বাসার কাছাকাছি ডালে বসে পাহারায় থাকে। ১৫–২০ দিন পর্যন্ত পানকৌড়ি শাবকদের আগলে রাখে। এক মাসের মধ্যেই পানকৌড়ির শাবক নীড় ছেড়ে স্বাধীন জীবন যাপনে সক্ষম হয়ে উঠে।

শিখন/শিক্ষণ আচরণ (Learning or Learned Behaviour)

প্রতিটি প্রাণী নির্দিষ্ট সহজাত আরচণ নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে যা তার জীবন যাপনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলনের জন্য এ আচরণ যথেষ্ট নয়। বরং তাকে টিকে থাকতে হলে অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের মাধ্যমে নতুন নতুন কৌশল রপ্ত করতে হয়। অর্জিত ও অভিজ্ঞতার আলোকে পরিবর্তিত এ আচরণই **শিখন** বা **শিক্ষালব্ধ আচরণ**। শিখন আচরণ বংশানুসরণযোগ্য নয় অর্থাৎ প্রাণীর ব্যক্তি জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। **C.T Morgan** ও **R.A. King** (১৯৬৬) অনুযায়ী-**অতীত অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের ফলে আচরণের অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ও সমাজ স্বীকৃত পরিবর্তনই হলো– শিখন**।

শিখন আচরণের বৈশিষ্ট্য : (i) জন্মগত নয়, বরং অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত হয়। (ii) জটিল প্রকৃতির এবং সর্বদা পরিবর্তনশীল। (iii) বংশপরম্পরায় প্রদর্শিত হয় না। (iv) অভিযোজনীয় এবং অভিজ্ঞতার আলোকে বিকাশিত হয়। (v) উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নতুন সম্পর্ক স্থাপন করে। (vi) পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করে। (vii) প্রজাতির জন্য সুনির্দিষ্ট নয়।

শিখন একটি জীবনব্যাপী আচরণ। সাধারণত প্রাণীকে আট ধরনের শিখন আচরণ করতে দেখা যায়। এগুলো হলো– (i) **অভ্যাসজনিত শিখন** (Habituation); (ii) **অনুকরণ** (Imprinting); (iii) **সাপেক্ষ প্রতিবর্ত** (Conditioned reflex); (iv) **চেষ্টা ও ত্রুটির মাধ্যমে শিখন** (Trial and Error learning); (v) **সুপ্ত শিখন** (Latent learning); (vi) **অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন** (Insight learning); (vii) **যৌক্তিক শিখন** (Reasoning); (viii) **বোধসূচক শিখন** (Cognition)। (পাঠ্যসূচি অনুযায়ী এখানে কেবল অভ্যাসজনিত শিখন ও অনুকরণ নিয়ে আলোচনা করা হলো।)

অভ্যাসজনিত শিখন (Habituation)

অভ্যাসজনিত আচরণ হচ্ছে সরলতম ধরনের শিখন। এ ধরনের আচরণে কোনো পুরস্কার বা তিরস্কারের (শাস্তির) সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন একটি উদ্দীপনার ঘন ঘন পুনরাবৃত্তির ফলে আচরণগত সাড়াদানে ক্রমশ ভাটা পড়ে যায়, এক সময় প্রাণী ওই উদ্দীপনায় আর কোনো সাড়াই দেয় না। এ আচরণের মাধ্যমে প্রাণী নতুন পরিবেশে ক্রমান্বয়ে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর মধ্য দিয়ে অভিযোজিত হয়। অভ্যাসগত আচরণে প্রাণী শুধু নতুন উদ্দীপনায় অভ্যস্তই হয় না, বরং কম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দীপনা বর্জনেও উদ্যোগী হয়।

যেমন– একটি পোষা কুকুরের উপস্থিতিতে শব্দ করলে কুকুরটি মাথা উঁচু করে সাড়া দেয়। যদি ঘন ঘন শব্দ সৃষ্টি করা হয় তখন আর তেমন সাড়া পাওয়া যায় না। এ পরিবর্তন অবসাদগ্রস্ততার কারণে কিংবা সংবেদগ্রাহকগুলোর অভিযোজনের ফলে ঘটে না, বরং অভ্যাসজনিত কারণে ঘটে থাকে। এ সাড়াদান দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে, এমনকি সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হলে প্রাণীটি ওই উদ্দীপনায় আর কখনওই সাড়া দেবে না। তা কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস পর প্রয়োগ করলেও কাজ হবে না। প্রাণিজগতের তথা জীবজগতের সব গোষ্ঠীতেই, অভ্যাসগত শিক্ষণ আচরণ দেখা যায়। শস্যক্ষেতে আপদ পাখি তাড়ানোর জন্য বাংলাদেশের সবখানে মাটির হাড়িতে রং মেখে যে ভয়াল চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয় তা দেখে আপদ পাখি কিছুদিন ভয়ে থাকে। পরে চলৎশক্তিহীন গড়নটিকে আর আমলে নেয় না, বরং ফিঙ্গে পাখির বসার জায়গা হয় (পোকা-মাকড় খাওয়ার জন্যে উড়তে সুবিধা হয়)। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও এমন ঘটনা ঘটে। রেলস্টেশনের পাশে অবস্থিত বাসা বাড়ীতে ট্রেনের শব্দে রাত যাপনের কথা অনেকে চিন্তাই করতে পারবে না, কিন্তু কিছুদিন বাস করলে ট্রেনের শব্দ বা হুইসেল কোনোটাই আর ঘুমের ব্যাঘাতের কারণ হবে না। এটাই অভ্যাসজনিত আচরণ। মাথার উপরে বিরক্তিকর শোঁ শোঁ শব্দে ঘুরতে থাকা ফ্যানের শব্দে আমরা এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা বা আলোচনা সভা কোনটিতেই এর প্রভাব পড়ে না। এ আচরণের সমস্ত আদর্শ, বৈশিষ্ট্য ও পুনরুদ্ধার (recovery) একটি নিউরন ও নিউরোমাসকুলার সংযোগেও প্রদর্শিত হতে পারে।

অনুকরণ (Imprinting)

অনুকরণ অন্যতম শিখন আচরণ। এটি হচ্ছে প্রাণীর পরিস্ফুটনকালে তরুণ প্রাণীতে অত্যন্ত সংবেদনশীল ধাপে (critical period) একটি নির্দিষ্ট উদ্দীপনার প্রতি সৃষ্ট স্থায়ী আচরণ। ডিম ফুটে সদ্যজাত হাঁসশাবক নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে হাটতে সক্ষম হলেই নীড় ছেড়ে কেবল মাকে অনুকরণ করে দূরে চলে যায়, অন্য কাউকে অনুসরণ করে না। কিন্তু ডিম যদি ইনক্যুবেটারে ফুটানো হয় কিংবা ডিমফুটে হাঁসশাবক বের হওয়ার পরপরই মা-হাঁসকে সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে শাবকগুলো চোখ মেলে প্রথম যে বড় সচল বস্তু দেখবে তাকেই অনুসরণ করবে। তরুণ বয়সেও ওই সচল বস্তুকে অনুসরণ করে চলবে। তখন আসল মাকে ফিরিয়ে দিলেও 'নকল' মা-ই ওদের কাছে আসল বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ নকল মা-ই হাঁস শাবকদের কাছে আসল মা হিসেবে স্থায়ীভাবে 'মুদ্রিত' হয়ে যাবে। এভাবে পরিস্ফুটনের মুহূর্তে কোনো সচল বস্তু, ব্যক্তি কিংবা গন্ধ-ও উদ্দীপনা হিসেবে কাজ করতে পারে। পরিস্ফুটনকালে সংবেদনশীল মুহূর্ত প্রজাতিভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। এ সময়কাল জন্মের কয়েক ঘন্টা থেকে কয়েক দিন বা মাস এমনকি কয়েক বছরও হতে পারে। তবে জন্মের পর পাখি বা স্তন্যপায়ীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালনের উদ্যোগ নিলে পোষ মানানো সহজ হয়। সার্কাসে পশু নিয়ে খেলা দেখানোর প্রাণিগুলোকে একারণে খুব কম বয়সে আসল মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়।

শুধু সচল বড় বস্তুই নয়, আগেই বলা হয়েছে যে, গায়ের গন্ধও শাবকরা অনুসরণ করে। **চিকা** (shrew) নামে পরিচিত গন্ধ মুষিকের শাবকেরা মায়ের গায়ের গন্ধে উদ্দীপ্ত হয়। বাচ্চাসহ কোথাও যেতে চাইলে মায়ের গা থেকে ক্ষরিত গন্ধে শাবকরা একজন আরেকজনের শরীর কামড়ে ধরে রেলের বগির মতো পরস্পরের পেছনে থেকে অগ্রসর হয়, মায়ের অবস্থান থাকে একেবারে সামনে। গবেষণায় দেখা গেছে, জন্মের পর ৫ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে মুষিকশাবকেরা গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ৫-৬ দিন বয়সী শাবকদের যদি অন্য প্রজাতির মা-মুষিককে বিকল্প হিসেবে দেওয়া হয় তাহলে 'বিকল্প' বা 'নকল' মাকেই আসল মনে করে দিন কাটায়। দিন ১৫ পর যদি শাবকগুলোর কাছে আসল মাকে ফেরত দেওয়া হয় তাহলেও আর গৃহীত হয় না। কিন্তু বিকল্প মায়ের গায়ের গন্ধে মাখানো কাপড়ের টুকরাকেও তারা অনুসরণ করতে রাজী থাকে।

সহজাত আচরণ ও শিখন আচরণের মধ্যে পার্থক্য

সহজাত আচরণ	শিখন আচরণ
১. সহজাত আচরণ জন্মগত, শিক্ষা বা অভিজ্ঞতালব্ধ নয়।	১. শিখন আচরণ জন্মগত নয়, বরং অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত।
২. সহজাত আচরণ বংশপরম্পরায় প্রদর্শিত হয়।	২. শিখন আচরণ বংশপরম্পরায় প্রদর্শিত হয় না।
৩. সহজাত আচরণ প্রজাতির জন্য সুনির্দিষ্ট।	৩. শিখন আচরণ প্রজাতির জন্য সুনির্দিষ্ট নয়।
৪. সহজাত আচরণ স্থির অর্থাৎ অপরিবর্তনশীল।	৪. শিখন আচরণ অস্থায়ী অর্থাৎ পরিবর্তনশীল।
৫. সহজাত আচরণ অভিযোজনের ফলে কিংবা অভিজ্ঞতার আলোকে বিকশিত হয় না।	৫. শিখন আচরণ অভিযোজনের ফলে কিংবা অভিজ্ঞতার আলোকে বিকশিত হয়।
৬. সহজাত আচরণ সাধারণত স্বভাবজাত, এর সাথে বুদ্ধির কোনো সম্পর্ক নেই, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নৈপুন্যের প্রয়োজন হয়।	৬. শিখন আচরণ স্বভাবজাত নহে, এর সাথে বুদ্ধির সম্পর্ক আছে।
৭. সহজাত আচরণ অনপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত হয়।	৭. শিখন আচরণ সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত হয়।
উদাহরণঃ বাবুই পাখির বাসা নির্মাণ, মাকড়সার, জাল বোনা ইত্যাদি।	উদাহরণ- কারখানার শব্দময় পরিবেশে শ্রমিকদের কাজ করতে পারা, জন্মের পর শিশুর মনোজগতে মায়ের ছাপ পড়া এবং মাকে অনুসরণ করা ইত্যাদি।

Pavlov এর তত্ত্ব

ইভান পিত্রোভিচ প্যাভলভ (Ivan Petrovich Pavlov, 1849 – 1936) ছিলেন একাধারে একজন বিখ্যাত রুশ শারীরবিজ্ঞানী (Physiologist) ও মনোবিজ্ঞানী (Phychologist)। সাপেক্ষ প্রতিবর্ত (conditioned reflex) সম্বন্ধে তিনি যুগান্তকারী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কুকুরের দেহে কিভাবে এসব প্রতিবর্ত সৃষ্টি হয় ও কাজ করে তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন। ১৯০৪ সালে তিনি শারীরবিজ্ঞান বা চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

কুকুরের লালার প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex Action of Dog's Saliva)

বিজ্ঞানী প্যাভলভ প্রতিবর্ত ক্রিয়াকে দুভাগে ভাগ করেছেন : (১) অনপেক্ষ (unconditioned) এবং (২) সাপেক্ষ (conditioned) প্রতিবর্ত ক্রিয়া। অনপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া সহজাত বা জন্মগত এবং কোনো শর্তের অধীন নয়। অন্যদিকে, সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া সহজাত নয়, বারংবার অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত হয়, এবং শর্তের অধীন। কুকুরের লালা ক্ষরণের সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিজ্ঞানী প্যাভলভ।

বিজ্ঞানী প্যাভলভ কুকুরের দেহে পরিপাকের শারীরবৃত্ত নিয়ে গবেষণা করেন। কুকুরদের খাওয়া পরিবেশনের দায়িত্বে ছিলেন গবেষণাগারের নির্দিষ্ট টেকনিশিয়ান। প্যাভলভ লক্ষ করলেন শুধু খাবার দেখলেই কুকুরের লালাক্ষরণ হতো না, যে টেকনিশিয়ান খাবার পরিবেশন করতেন তাঁর গায়ের সাদা গবেষণা কোট (lab-coat) দেখলেই লালাক্ষরণ শুরু হয়ে যেত। এ পর্যবেক্ষণ থেকে প্যাভলভ ধারণা করেন যে খাবার দেওয়ার সময় সুনির্দিষ্ট উদ্দীপনা যদি কুকুরের চারপাশে থাকে তাহলে সেই উদ্দীপনা খাবারের সঙ্গে মিশে গিয়ে কুকুরের লালাক্ষরণকে উদ্দীপ্ত করে। এ উদ্দীপনাকে তিনি মানসিক উদ্দীপনা (psychic stimulation) নামকরণ করেছেন। প্রাথমিক এ ধারণার ভিত্তিতে প্যাভলভ প্রকৃত গবেষণায় নিয়োজিত হন।

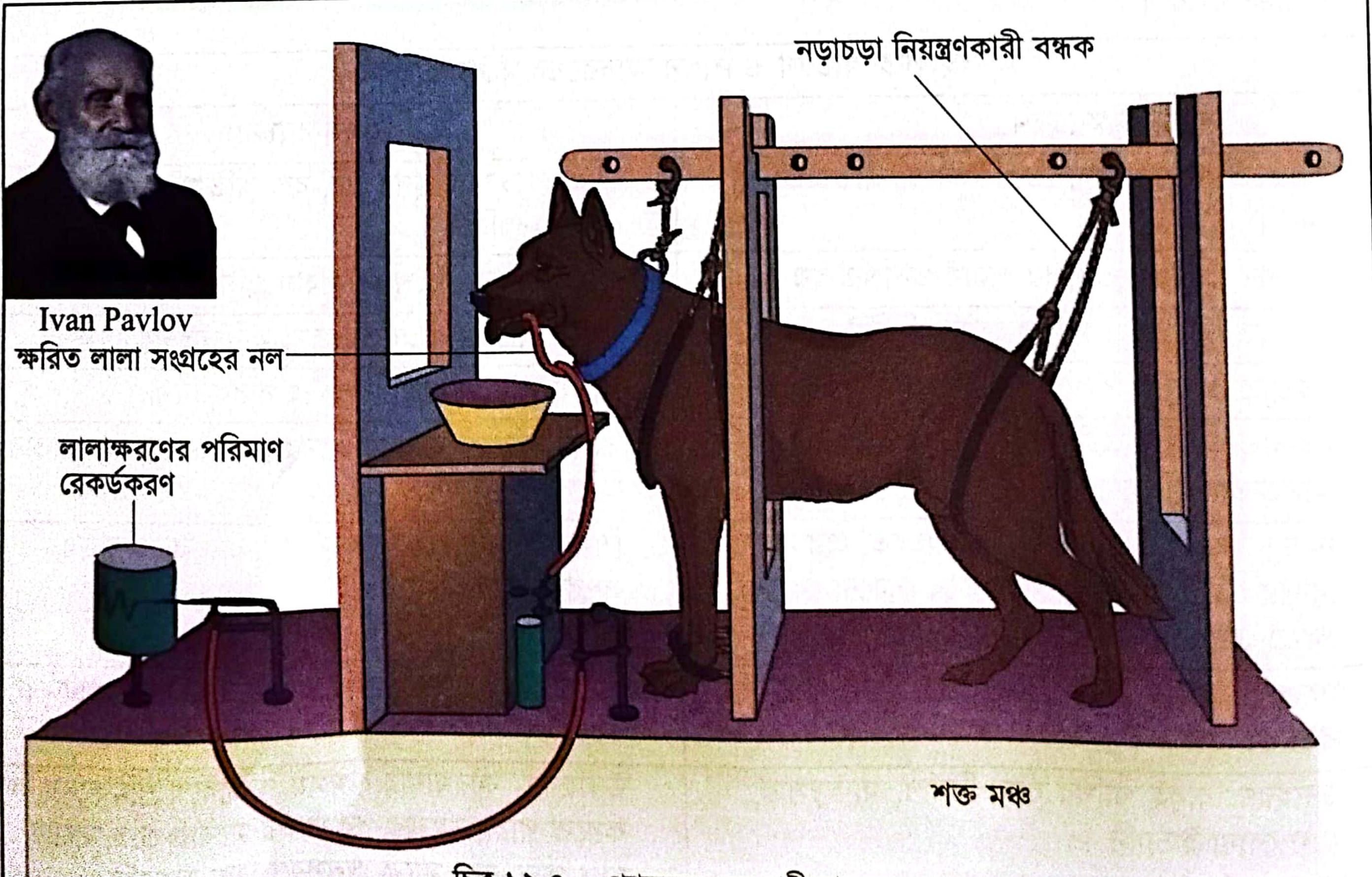

চিত্র ১২.৭ : প্যাভলভ-এর পরীক্ষা

বিজ্ঞানী প্যাভলভ গবেষণার খাতিরে একটি ক্ষুধার্ত কুকুরকে বিশেষভাবে নির্মিত শক্ত মঞ্চে দাঁড় করিয়ে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় বেল্ট লাগিয়ে দিলেন যেন কোনো অসুবিধা না হয়। বিশেষ প্রক্রিয়ায় লালা নালির সঙ্গে একটি নলের সংযোগ করে দেওয়া হলো। খাবার হিসেবে মাংসচূর্ণ দেওয়ার পর তিনি লালাক্ষরণের পরিমাণ রেকর্ড করে রাখেন। সঠিক পরিমাণ মাংসচূর্ণ মুখে গেলে নির্দিষ্ট পরিমাণ লালা ক্ষরণ হতে দেখা যায়। প্যাভলভ ক্ষুধার্ত কুকুরের মুখে মাংসচূর্ণ দেওয়ার ঠিক আগমুহূর্তে ঘন্টা বাজান। প্রথম দিকে বেশ কয়েকবার (১২বার) সমলয়ে ঘন্টাধ্বনি শোনানো ও মাংসচূর্ণ সরবরাহের পরও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। অন্ততঃ ১২ বার ঘন্টাধ্বনির পর উদ্দীপনার প্রতি সাড়া পাওয়া গেছে। তখন শুধু ঘন্টাধ্বনি শুনলেই কুকুরের লালাক্ষরণ শুরু হয়েছে। ঘন্টাধ্বনির সঙ্গে এমন সামঞ্জস্য রচিত হলো যে মাংসচূর্ণ না দিয়ে প্যাভলভ যতবার ঘন্টা বাজিয়েছেন ততবারই কুকুরে লালাক্ষরণ হয়েছে। ক্ষরণের পরিমাণ শুধু মাংসচূর্ণ দিলে যতোখানি হয় ঠিক ততোখানি।

উপরোক্ত গবেষণার আলোকে **প্যাভলোভিয়ান কন্ডিশনিং** (Pavlovian conditioning) **বা চিরায়ত সাপেক্ষণ** (classical conditioning)-কে সংক্ষেপে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায়।

১. এমন অনেক বিষয় আছে যা একটি কুকুরের জানার প্রয়োজন নেই– ঐ ধারণা থেকে প্যাভলভ তাঁর গবেষণা শুরু করেন। যেমন– যখন আহার দেখবে তখন লালাক্ষরণ করবে এমন বিষয় শেখার দরকার নেই। এ প্রতিবর্ত কুকুরে নিহিত আছে। এটি একটি **অনপেক্ষ সাড়া** (unconditioned response, অর্থাৎ উদ্দীপনা-সাড়াদান শেখার বিষয় নয়)।

২. প্যাভলভ আবিষ্কার করেন যে খাবারের সঙ্গে এমন কিছু (যেমন- গবেষণা টেকনিশিয়ান) জড়িত রয়েছে যা অনপেক্ষ সাড়াদানকে উসকে দেয়।

৩. গবেষণা টেকনিশিয়ানের গায়ে সাদা ল্যাব-কোট প্রথমে **নিরপেক্ষ উদ্দীপনা** (neutral stimulus) ছিল। কারণ এটি কোনো **সাড়া** (response) সৃষ্টি করেনি। কিন্তু ল্যাব-কোট গায়ে দেয়া মানুষটি (নিরপেক্ষ উদ্দীপনা) খাদ্যরূপী অনপেক্ষ উদ্দীপনার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে।

৪. প্যাভলভ তাঁর গবেষণায় একটি ঘন্টাকে নিরপেক্ষ উদ্দীপনা হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তিনি কুকুরকে খাবার দেওয়ার ঠিক পূর্বমুহূর্তে ঘন্টা বাজাতেন।

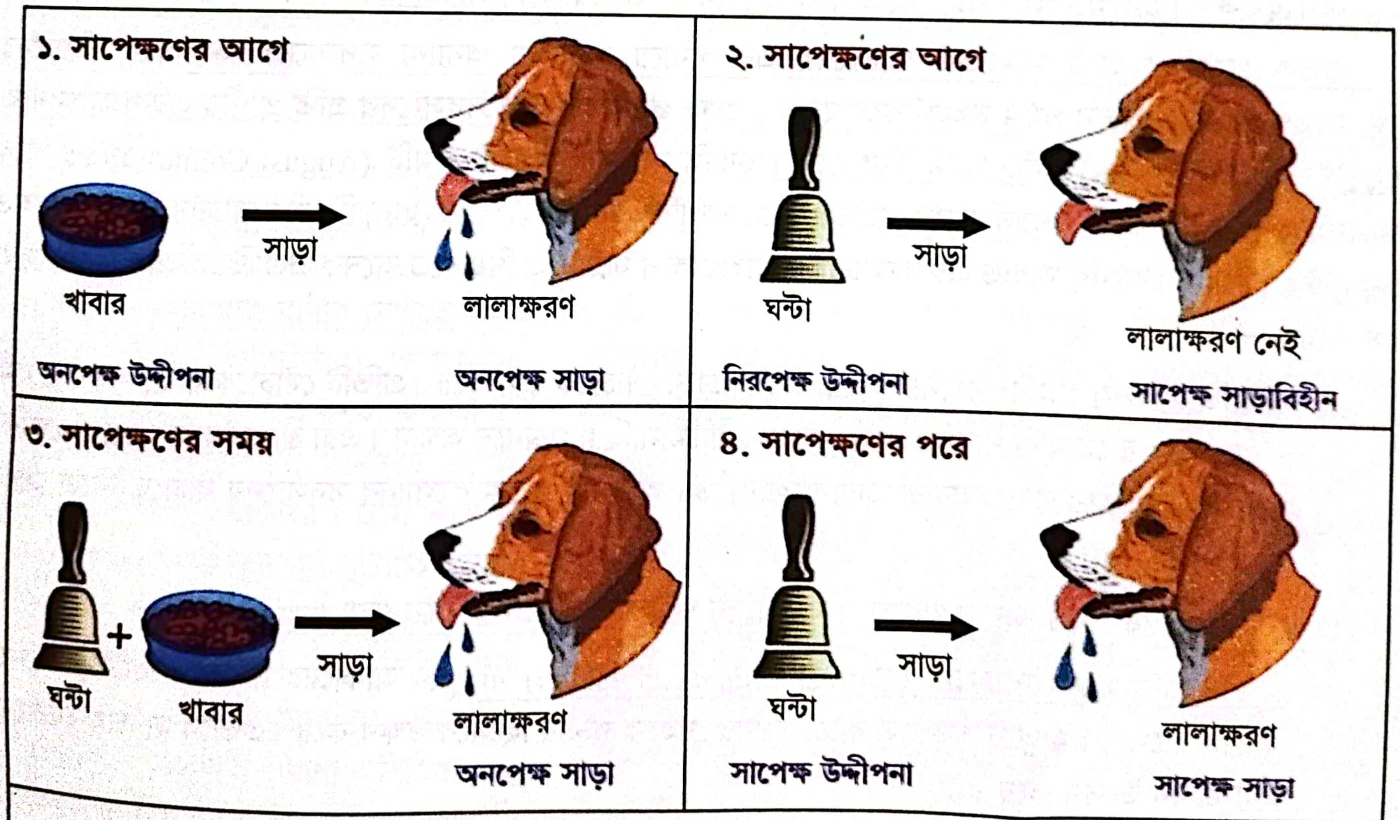

চিত্র ১২.৮.: চিরায়ত সাপেক্ষণ

৫. দেখা গেল, অনেকবার পুনরাবৃত্তির পর কুকুরটি ঘন্টাধ্বনি ও খাদ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত এক নতুন আচরণে শিক্ষিত হয়েছে। যেহেতু সাড়াটি শিক্ষণজনিত (বা সাপেক্ষ) তাই একে **সাপেক্ষ সাড়া** (conditioned response) বলে। এভাবে নিরপেক্ষ উদ্দীপনা অনপেক্ষ উদ্দীপনার সঙ্গে মিলিত হয়ে **সাপেক্ষ উদ্দীপনা** (conditioned stimulus)-য় পরিণত হয়েছে।

সামাজিক আচরণ (Social Behaviour)

একই প্রজাতিভুক্ত কিছু সংখ্যক প্রাণীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কারণে বিশেষ শৃঙ্খলার সাথে একত্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করা এবং তাদের মধ্যকার পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপকে সামাজিক আচরণ বলে। এটি একপ্রকার সহজাত আচরণ। প্রাণিজগতের মধ্যে পিঁপড়া, মৌমাছি, বোলতা, উইপোকা, মাছ, পাখি ও প্রাইমেট স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে সামাজিক আচরণ দেখা যায়। এ ধরনের আচরণে একই উপনিবেশে বসবাসকারী প্রাণীরা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং প্রত্যেকে পরস্পরের সহযোগী।

সামাজিক আচরণের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। প্রজননের জন্য একটি প্রজাতিতে যখন স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে আন্তঃক্রিয়া গড়ে উঠে তখন তাকে **ব্যক্তি স্তর** বলে এবং এটিই সর্বনিম্ন স্তর। আবার একই প্রজাতির কয়েকজন সদস্য (পিতা, মাতা ও সন্তান) মিলে **গোত্র স্তর** গঠন করে। এভাবে কয়েকটি গোত্র মিলে **দল স্তর** কিংবা জনগোষ্ঠী পর্যায়ে **কলোনী স্তর** ও **সম্প্রদায় স্তর** গঠন করে।

সামাজিক আচরণের বৈশিষ্ট্য : (i) এতে একই প্রজাতিভুক্ত অনেক সদস্য একসাথে বিভিন্ন রকমের সহযোগিতা দেখানোর মাধ্যমে সম্পর্কিত থাকে। (ii) পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সদস্যদের নিয়ে একটি নির্দিষ্ট সংগঠন তৈরি হয় যাতে সুস্পষ্ট শ্রমের (দায়িত্বের) বণ্টন থাকে। (iii) অনেক সময় একের বেশি জনু (generation) কে একত্রে বসবাস করতে দেখা যায় (যেমন–দাদা-দাদী, বাবা-মা ও সন্তান)। (iv) সর্বক্ষেত্রেই সামাজিক দলের মধ্যে কোন না কোন সদস্যের আত্মত্যাগের ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। এটি **পরার্থপরতা** বা **অ্যাল্ট্রুইজম** (altruism) নামে পরিচিত।

অ্যাল্ট্রুইজম (Altruism) : পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা বা পরার্থপরতা

কতক প্রজাতির প্রাণী সামাজিক আচরণের এক পর্যায়ে স্বজাতীয় অন্যান্য সদস্যদের কল্যাণার্থে নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ এমনকি জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে থাকে। **একই প্রজাতির অন্য সদস্যদের প্রতি প্রাণীর এরূপ আচরণকে অ্যাল্ট্রুইজম বা পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা বলে।** ফরাসি দার্শনিক **অগাস্ট কমটি** (August Comte) ১৮৫১ সালে সর্বপ্রথম Altruism শব্দটি প্রণয়ন করেন। রক্তের সাথে সম্পর্কিত নিকটাত্মীয়দের (kin) ঘিরে এ আচরণ বিকশিত হলেও ভিন্ন দুটি গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যেও এরূপ আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। প্রাণিজগতে অনেক প্রজাতিতে অ্যাল্ট্রুইজম দেখা যায়। যেমন–

১. **সামাজিক পতঙ্গ** যেমন– মৌমাছি, এরা দলবদ্ধভাবে মৌচাকে বাস করে। প্রতিটি মৌচাকে রাণী, পুরুষ ও কর্মী এ তিনজাতের মৌমাছি থাকে। এদের মধ্যে কর্মী মৌমাছিরা প্রজননে অক্ষম। এরা স্ত্রী মৌমাছির যত্ন, কলোনির জন্য পরিশ্রম করে যায় এমনকি তারা বহিরাগতের আক্রমণ থেকে কলোনির সদস্যদের বাঁচাতে নিজে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেয়।

২. **বেবুন** ৬ বছর পর্যন্ত তার সন্তানকে লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণে কাটিয়ে দেয়।

৩. **জাপানি ফলিয়েজ মাকড়সার** (*Chiracanthium japonicum*) মা বৃহৎ আকারের ডিমের পিণ্ডটি বুকে নিয়ে আগলে রাখে। ডিম ফুটে শত শত বাচ্চা মায়ের দেহকে খাবার হিসেবে ভক্ষণ করে। এভাবে মা তার বাচ্চাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করে।

৪. রক্তচোষা বাদুর (Vampire bats) দলের যেসব সদস্য রাতে খাবার খেতে ব্যর্থ হয় তাদের জন্য খাবার গ্রহণকারী সদস্যরা রক্ত উদগীরণ করে খাওয়ায়।

৫. আফ্রিকার ভারভেট বানর (Vervet monkeys) শিকারির উপস্থিতি টের পেলে অন্যান্য সদস্যের জন্য একটি সতর্ক সংকেত প্রদান করে, এমনকি শিকারিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করে যাতে অন্যান্য সদস্যরা নিরাপদে পালিয়ে যেতে পারে।

৬. ডলফিন অসুস্থ সদস্যদেরকে পানির ধাক্কা দিয়ে সাহায্য করে যেন তারা পানিতে শ্বাস নেয়া চালিয়ে বেঁচে থাকতে পারে।

৭. বাংলাদেশের সুন্দরবনের চিত্রা হরিণ ও রেসাস বানরের অ্যাল্ট্রুইজম বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। গাছের মগডালে থাকা বানরেরা বিশেষ শব্দ করে বাঘ আসার বিপদসংকেত হরিণদের দেয়। বিপদসংকেত পেয়ে হরিণেরা নিরাপদ আশ্রয়ে পলায়ন করে। আবার হরিণদের খাদ্য সংকটের সময় বানরেরা গাছের মগডাল থেকে পাতা ও কচি ডাল ভেঙে মাটিতে ফেলে দিয়ে খাদ্য সহায়তা দিয়ে থাকে।

মৌমাছির সামাজিক আচরণে অ্যাল্ট্রুইজম বা পরার্থপরতা

মৌমাছির প্রকারভেদ

মৌমাছি Arthropoda পর্বের Insecta শ্রেণির Hymenoptera বর্গের Apidae গোত্রের *Apis* গণের সামাজিক প্রাণী।

বাংলাদেশে তিন প্রজাতির মৌমাছি পাওয়া যায়–

১. ***Apis indica*** **:** এরা পাহাড়ি অঞ্চলে, সমতল ভূমি, বনে-জঙ্গলে, দালান বা ঘরের সুবিধাজনক স্থানে বাসা তৈরি করে। মধু সংগ্রহের জন্য এ জাতীয় মৌমাছিই কৃত্রিম উপায়ে চাষ করা হয়।

২. ***Apis dorsata*** **:** এরা গাছের শাখায় বা ফোকরে, দালানের কার্নিশে বাসা তৈরি করে। তবে এরা বছরে একবার পরিযায়ী হয়ে পাহাড়ি এলাকায় চলে যায়।

৩. ***Apis florea*** **:** এরা আকারে খুব ছোট এবং চাকটি ৬ ইঞ্চির মতো লম্বা। এরা গাছের ডালে কিংবা ঘরের কার্নিশে চাক তৈরি করে।

উপরিল্লিখিত ৩টি প্রজাতি ছাড়াও ইউরোপ ও আফ্রিকায় যথাক্রমে *Apis mellifera* ও *Apis adamsoni* প্রজাতির মৌমাছি পাওয়া যায়।

একটি মৌচাকে তিন ধরনের মৌমাছি থাকে– ১. রাণী, ২. পুরুষ ও ৩. কর্মী। নিচে এদের বিবরণ দেয়া হলো।

১. রাণী মৌমাছি (Queen Bee) : মৌমাছির মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় রাণীই সমাজের মধ্যমণি। প্রতিটি মৌচাক একটি মাত্র রাণীর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। মৌচাকের অন্যান্য সদস্য অপেক্ষা রাণীর দেহ অপেক্ষাকৃত বড় (লম্বায় ১৫-২০ মিলিমিটার), পা মজবুত, উদর প্রলম্বিত, উদরের শেষ ভাগ ক্রমশ সরু। দেহের তুলনায় ডানাদুটি ছোট। এদর লালাগ্রন্থি থাকেনা। হুলে বার্ব না থাকায় এরা বার বার হুল ফুটাতে পারে। সঙ্গমের পর রাণী দিনে ১৫০০-২০০০ ডিম পাড়তে সক্ষম। ডিম নিষিক্তকরণ সম্পূর্ণরূপে রাণীর নিয়ন্ত্রণাধীন। কলোনির প্রয়োজন অনুযায়ী রাণী নিষিক্ত ও অনিষিক্ত ডিম পাড়ে কিংবা নতুন কলোনি

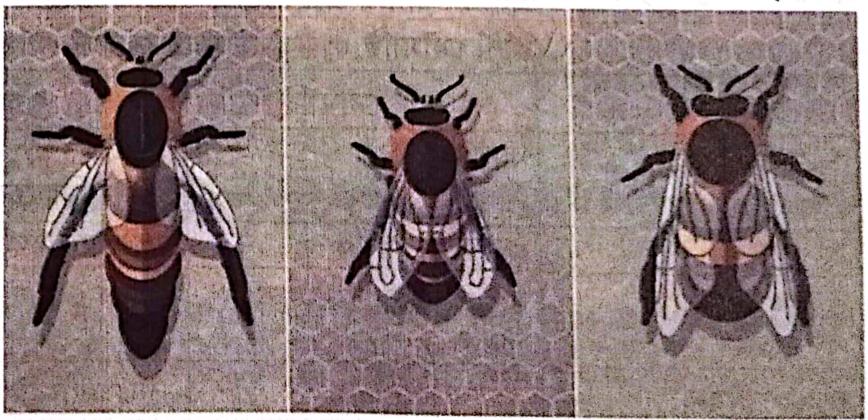

রাণী মৌমাছি　　কর্মী মৌমাছি　　পুরুষ মৌমাছি

চিত্র ১২.৯ : বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মৌমাছি

সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কিছু কর্মী ও পুরুষ মৌমাছিসহ অন্যত্র গমন করে। ভবিষ্যৎ রাণীর লার্ভাগুলো তরুণ কর্মী মৌমাছির গলবিলীয় ও ম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত **নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ রাজকীয় জেলি** (royal jelly) খেয়ে বড় হয়, ফলে রাণী মৌমাছিতে রূপান্তরিত হয়। এ ঘটনাকে **সুপার সিডিওর** (super sedure) বলে। ১৬ দিনের মধ্যে মৌমাছিরা রাণীকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলে। নতুন রাণী বের হয়ে **মৌচাকে** বিকাশরত অন্যান্য রাণীদের হুল ফুটিয়ে হত্যা করে। একই সময়ে দুটি নতুন রাণী বের হলে এরা **মরণযুদ্ধে** (duel to the death) লিপ্ত হয়। যুদ্ধে জয়ী রাণী কলোনির সার্বিক দায়িত্বভার গ্রহণ করে।

রাণী মৌমাছি অধিকাংশ সময় মৌচাকের মধ্যে অবস্থান করে। কেবল **সঙ্গম উড্ডয়ন** (nauptial flight)-এর সময় মৌচাক থেকে বের হয়ে আসে। এরা জীবনে একবার কয়েকশ পুরুষের সাথে সঙ্গমে অংশগ্রহণ করে অসংখ্য শুক্রাণু গ্রহণ করে যা সারাজীবন ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে। রাণী মৌমাছি ৩-৫ বছর বাঁচে।

কাজ : রাণী মৌমাছির প্রধান কাজ ডিম পাড়া। জীবদ্দশায় একটি রাণী মৌমাছি প্রায় দেড় লক্ষ ডিম পাড়ে। এছাড়া এটি কলোনির প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে। এর মস্তক থেকে ক্ষরিত তরল **ফেরোমন** (Pheromone = Oxydecenoid acid) মৌচাকের বিভিন্ন সদস্যদের সংঘবদ্ধ রাখতে সাহায্য করে।

২. **পুরুষ মৌমাছি** (Drones) : এরা রাণী ও কর্মী মৌমাছির মাঝামাঝি আকৃতির (১৫–১৭ মিলিমিটার লম্বা), প্রশস্ত ও সুগঠিত দেহ, বৃহৎ চোখ বিশিষ্ট। এদের মোমগ্রন্থি, পরাগ সংগ্রাহক যন্ত্র এবং হুল থাকেনা। কলোনিতে ৩০০–৩০০০ পর্যন্ত পুরুষ মৌমাছি থাকে। অনিষিক্ত ডিম থেকে **পার্থেনোজেনেসিস** (parthenogenesis) প্রক্রিয়ায় পুরুষ মৌমাছি সৃষ্টি হয়। সেজন্য এরা **হ্যাপ্লয়েড** (n) প্রকৃতির হয়ে থাকে।

কাজ : পরিণত পতঙ্গে রূপান্তরিত হওয়ার ১০ দিন পর এরা রাণীকে নিষিক্ত করতে সক্ষম হয়। প্রায় ৫০০ পুরুষ সঙ্গম উড্ডয়নে অংশ গ্রহণ করে। সঙ্গমই পুরুষ মৌমাছির একমাত্র কাজ। এরা জীবনে কেবল একবার রাণী মৌমাছির সাথে যৌন মিলনের আকাঙ্খায় অপেক্ষা করে এবং মিলনের পর মৃত্যুবরণ করে।

৩. **কর্মী মৌমাছি** (Workers) : যেসব স্ত্রী লার্ভা কেবল মধু ও বি-ব্রেড খেয়ে বড় হয় তারা বন্ধ্যা কর্মী মৌমাছিতে রূপান্তরিত হয়। এরা সংখ্যায় সর্বাধিক (৬০,০০০ – ৮০,০০০) এবং কলোনির ক্ষুদ্রতম সদস্য। এদের ডিম্বাশয় সৃষ্টি হয় না, তাই বন্ধ্যা অর্থাৎ এরা প্রজননে অক্ষম। এদের ডানাদুটি বেশ মজবুত হয় ফলে দ্রুত ডানা সঞ্চালন করতে পারে। এদের পায়ে **পরাগ সংগ্রহের থলি** বা **পরাগঝুড়ি** (pollen basket) এবং **রেণু চিরুনি** (pollen comb) থাকে। এদের উদরের অঙ্কীয়দেশে মোম নিঃসরণের জন্য **মোমগ্রন্থি** (wax gland) থাকে। দেহের শেষভাগে হুল এবং মস্তকে একটি **শোষক নল** বা **দীর্ঘ প্রোবোসিস** (probosis) বিদ্যমান। এদের আয়ুষ্কাল গড়ে ৫০ দিন। বসন্ত ও শীতকালে এরা কঠিন পরিশ্রমে লিপ্ত থাকায় আয়ু কমে যায়। এ সময় এরা মাত্র ৬ সপ্তাহ বাঁচে।

কাজ : শ্রমিক মৌমাছি মৌচাকের যাবতীয় কাজ করে। যেমনঃ মৌচাক নির্মাণ, নারী ও পুরুষের সেবা, মধু ও মকরন্দ বা পুষ্পসুধা সংগ্রহ, মৌচাক পাহারা দেয়া, চাক পরিষ্কার রাখা এবং সন্তান-লালন-পালন করা।

রাণী মৌমাছি, পুরুষ মৌমাছি ও কর্মী মৌমাছির মধ্যে পার্থক্য

বিষয়	রাণী মৌমাছি	পুরুষ মৌমাছি	কর্মী মৌমাছি
১. আকার	আকারে বড়।	আকারে কিছুটা ছোট। তবে কর্মী মৌমাছির চেয়ে অপেক্ষাকৃত বড়।	আকারে সবচেয়ে ছোট।
২. প্রজনন	প্রজননে সক্ষম।	প্রজননে সক্ষম।	প্রজননে অক্ষম।
৩. মধু ও পরাগ সংগ্রহ	মধু ও পরাগ সংগ্রহে অংশ নেয় না।	অংশ নেয় না।	অংশ নেয়।
৪. ফেরোমন	নিঃসৃত করে।	নিঃসৃত করে না।	নিঃসৃত করে না।
৫. আয়ুষ্কাল	প্রায় ৩-৫ বছর।	প্রায় ৫০-৬০ দিন।	প্রায় ৫০ দিন।
৬. প্রতি মৌচাকে সংখ্যা	একটি।	৩০০ – ৩০০০	৬০-৮০ হাজার।

রাজকীয় জেলি (Royal jelly) : এটি কর্মী মৌমাছির হাইপোফ্যারিঞ্জিয়াল ও ম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত সাদা বর্ণের পুষ্টিকর খাদ্য যা রাণী মৌমাছিকে লার্ভা ও পূর্ণাঙ্গ দশায় খাওয়ানো হয়। এর রাসায়নিক উপাদান হলো: পানি ৬০%–৭০%, প্রোটিন ১২%–১৫, লিপিড ৩%–৬%, চিনি ১০%–১৬%, ভিটামিন ২%–৩%, লবণ ও অ্যামিনো এসিড। তবে ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ু আবহাওয়ার উপর এ উপাদানের পরিমাণ নির্ভরশীল। প্রোটিন ও অ্যামিনো এসিড সমৃদ্ধ হওয়ায় এ জেলি ত্বকের পরিচর্যায় ব্যবহৃত হয়।

মৌমাছির সামাজিক সংগঠন (Social Structure of Honey Bee)

মৌমাছি সামাজিক প্রাণী। একেকটি বড় পরিবার গড়ে বা বসতবদ্ধ হয়ে মৌচাকে বাস করে। প্রত্যেকটি কলোনিতে মৌমাছির ৩টি সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যরা সম্মিলিতভাবে সামাজিক উন্নয়নে নিরলস কাজ করে চলে। একটি মাত্র রাণীর নেতৃত্ব কয়েকশ ড্রোন (বা পুরুষ মৌমাছি) এবং ৬০– ৮০ হাজার কর্মী মৌমাছি (বন্ধ্যা স্ত্রী মৌমাছি) যে সুশৃঙ্খল উপায়ে নীরবে নিভৃতে সামাজিক দায়িত্ব পালন করে চলেছে তা লক্ষ বছর ধরে মানুষ জানবার চেষ্টা করেছে। তাদের এ মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা মৌমাছি গোষ্ঠীর সকল মৌলিক চাহিদা মিটিয়ে প্রাণিজগতে অনন্য নজির স্থাপন করেছে। নিচে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপব্যবস্থাবলীর মাধ্যমে মৌমাছিরা দৃঢ় সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে বাস করে।

১. **শ্রম বন্টন** : কর্মীদের মধ্যে অস্থায়ী দায়িত্ব বন্টন মৌমাছি কলোনির এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। কর্মী মৌমাছির আচরণ সাধারণত বয়স, চাকের অভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। কলোনিবাসীর জন্য নিবেদিত প্রাণ কর্মী মৌমাছিদের শৈশব বলতে কিছু নেই। ৩-৪ দিন বয়সেই তারা চাকের মধু-কুঠুরি পরিষ্কারের কাজে লেগে যায়। ১৮–২০ দিন বয়স হলে মধু আহরণে বের হয়। এর পূর্ব পর্যন্ত তারা রক্ষী হিসেবে বাসা পাহারা দেয়। শেষ বয়সে কর্মী মৌমাছি পানি বহন করে, অবসর যাপন করে এবং বেশি দূরে যায় না। বিবর্তনের গতিপথে তারা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গুণের অধিকারী হয়েছে, যথা– বহিঃপরিবেশগত অবস্থার হঠাৎ পরিবর্তন ঘটলে কলোনির স্বার্থে বয়স নির্বিশেষে সবাই এক কাজ ছেড়ে অন্য কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অনেক সময় বাইরে অবস্থানরত মৌমাছিরা ঝড়-বাদলে আটকা পড়ে কলোনিতে ফিরতে পারে না, কিংবা শস্যক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়ায় অনেকে মারা গেলে বয়স অনুযায়ী কাজের ধারা বিঘ্নিত হয়। তরুণ সদস্যরা সুধা আহরণের গতিকে কখনও ছিন্ন হতে দেয় না।

২. **খাদ্যের যোগান** : যে কোনো সমাজের প্রথম ও প্রধান মৌলিক চাহিদা খাদ্য। মৌ-নেতৃত্ব এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ আপোসহীন। দুর্যোগ মোকাবেলায় বিশেষ করে শীতকালে এবং প্রতিদিনকার খাদ্যের সংস্থান ও মজুত গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি কলোনির অগণিত কর্মী মৌমাছি সকাল-সন্ধ্যা অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলে। মৌচাকের এক নির্দিষ্ট স্থানে নিজেদের জন্য এবং ভাবী বংশধরদের জন্য খাদ্য জমিয়ে রাখে।

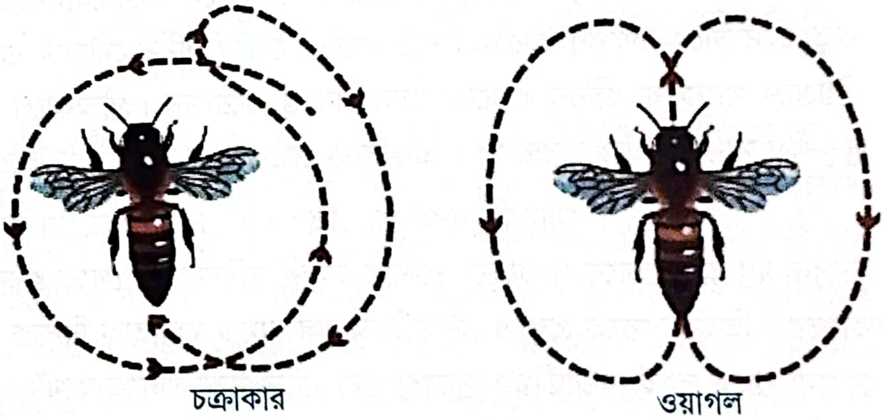

চিত্র ১২.১০ : মৌমাছির নৃত্য

৩. **ভাব বিনিময়** : সুশৃঙ্খলতাই একটি জাতির সমৃদ্ধি ও উন্নতির চাবিকাঠি। মৌমাছির কলোনি প্রাণিজগতের অন্যতম সুশৃঙ্খলতম ও আদর্শ গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃত। মৌমাছিরা তাদের ভাবাবেগ কিছুটা প্রকাশ করে গুঞ্জনের মধ্যে দিয়ে পরস্পরের মধ্যে ভাববিনিময় করে গন্ধবস্তু ও বিশেষ নৃত্য-ভঙ্গিমায়।

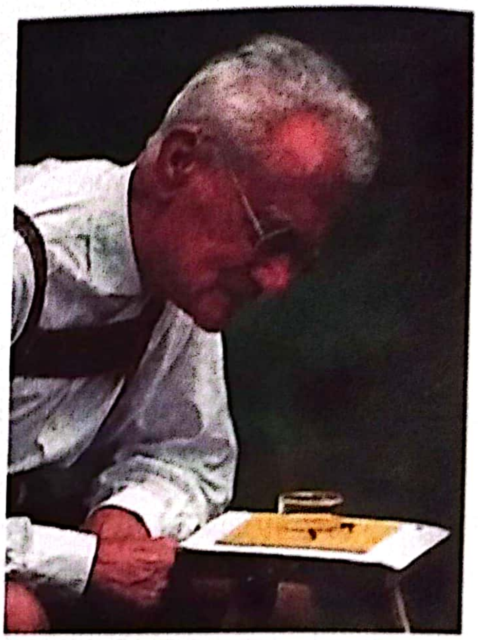

Karl von Frisch (1886 - 1982)

মৌমাছির নৃত্যকে **মৌমাছির ভাষা** (bee language) বলে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানি **কার্ল ফন ফ্রিস** (Karl von Frisch) মৌমাছির নৃত্যের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে প্রথম আলোকপাত করেন। এ জন্য তাঁকে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে নোবেল পুরষ্কার প্রদান করা হয়। মৌমাছির নৃত্য দু'প্রকারের – **চক্রাকার নৃত্য** (round dance) এবং **ওয়াগল নৃত্য** (waggle dance)। চক্রকার নৃত্যে কতগুলো বৃত্তাকার গতিপথের সৃষ্টি হয়। এ নৃত্যের মাধ্যমে এরা বাসা থেকে ১০০ মিটারের কম দূরত্বের কোনো খাদ্যের উৎস সম্পর্কে অন্যান্য সদস্যদের অবহিত করে। অপরদিকে ওয়াগল নৃত্যে এমন গতিপথ সৃষ্টি হয় যা একটি ইংরেজী "8" অক্ষরের মতো দেখায়। এ নৃত্যের মাধ্যমে মৌমাছি বাসা থেকে ১৫০ মিটারের অধিক দূরত্বের কোনো খাদ্যের উৎস সম্পর্কে অন্যান্য সদস্যদের অবহিত করে। রাণী মৌমাছির ত্বক-নিঃসৃত হরমোনের গুণযুক্ত এসিড চাকের সবখানে বিসরিত হয়ে সকল মৌমাছির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। নির্দিষ্ট ধরনের গতিবিধি বা মৌ-নৃত্য কলোনির মৌমাছিদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের অন্যতম প্রধান উপায়। সন্ধানী কর্মী মৌমাছির দেহে লেগে থাকা সুধা ও পরাগ দেখে খাদ্যের ধরণ সম্বন্ধেও মৌমাছিরা অবহিত হয়।

৪. **পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যরক্ষা** : বিবর্তনের গতিপথে মৌমাছিরা অনেক রোগ প্রতিরোধের উপায় করে নিয়েছে। কোনো ক্ষেত্রে প্রতিরোধের উপায় না থাকলে সামান্য মাত্রায় দমনের ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম। দেহের কাইটিনময় আবরণে আছে অ্যান্টিবায়োটিক গুণসম্পন্ন পদার্থ যা ক্ষতিকর অণুজীবের বৃদ্ধি ও বংশবৃদ্ধি দমন, এমনকি মেরেও ফেলতে পারে। মৌরুটি, মধু, এমনকি মৌচাকেও আছে অ্যান্টিবায়োটিক পদার্থ। মৌমাছিরা বাসা ও মৌচাকের প্রাচীর প্রোপেলিশ (বা মৌসিরিশ) নামে যে এক ধরনের জৈব রেজিনের প্রলেপ দিয়ে রাখে তাও ক্ষতিকারক অণুউদ্ভিদ-এর বৃদ্ধি প্রতিহত করে। রোগাক্রান্ত বা মৃত লার্ভাকে চাকের বাইরে ফেলে দিয়ে মৌমাছিরা সম্ভাব্য সংক্রমণ থেকে কলোনিকে রক্ষা করে। ঋতুভেদে চাকে তাপের তারতম্য ঘটে থাকে। মোমে গঠিত মৌচাক প্রায় তাপ অপরিবাহী হওয়ায় চাকে সব সময় তাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে যা জীবন ধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজন। গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড গরমে মৌমাছিরা মৌচাকের প্রবেশ মুখে সুশৃঙ্খল সারিবদ্ধ হয়ে সবার মাথা একদিকে রেখে ডানা ঝাঁপিয়ে ভিতরে শীতল বাতাস সঞ্চালিত করে।

৫. **প্রতিরক্ষা** : মৌমাছি খুবই শান্তিপ্রিয়। অকারণে আক্রমণ করা তাদের স্বভাববিরুদ্ধ। তবু তাদের কষ্টার্জিত সম্পদ-মধু অবৈধভাবে সংগ্রহের উদ্দেশে আণুবীক্ষণিক জীব থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত অনেকেই চাকে হানা দেয়। তাদের প্রতিহত করতে প্রকৃতি মৌমাছিকে হুল নামক মারাত্মক বিষাক্ত অস্ত্রে সজ্জিত করেছে। একটি হুলের দংশন যে কোনো পতঙ্গ বা ইঁদুরজাতীয় ক্ষুদ্রদেহী স্তন্যপায়ীর মৃত্যু ঘটাতে যথেষ্ট।

৬. **সোয়ার্মিং ও জিনগত উন্নতি সাধন** : কলোনি-বিভক্তির মাধ্যমে মৌমাছিদের বংশবৃদ্ধি ঘটে। একটি মৌচাকে কর্মী মৌমাছির সংখ্যাধিক্য ঘটলে স্থানাভাবসহ আরও অনেক কিছুরই অভাব দেখা দেয়। তখন রাণী মৌমাছি কিছু কর্মী মৌমাছির চাপে নতুন আবাস গড়ার উদ্দেশে চাকের প্রায় অর্ধেক কর্মী মৌমাছিসহ ঝাঁক বেঁধে উড়ে যায়। এ প্রক্রিয়াকে সোয়ার্মিং বলে। পরিত্যক্ত চাকে নতুন রাণী পরিস্ফুটিত হয়। নতুন রাণী কয়েকটি পুরুষ অনুগামীসহ নাপসিয়াল উড্ডয়ন-এ পুরুষ (ড্রোন) মৌমাছির পর্যাপ্ত শুক্রাণু সংগ্রহ করে চাকে ফিরে আসে। সংগৃহীত শুক্রাণু দিয়ে রাণী আজীবন যত ডিম পাড়ে তার সবগুলোকেই নিষিক্ত করতে পারে। তাই রাণী জীবনে একবারই মাত্র সঙ্গমে লিপ্ত হয়। ডিম পাড়বার সময় রাণী ইচ্ছানুযায়ী ডিম নিষিক্ত করে। চাকের প্রয়োজনে নিষিক্ত বা অনিষিক্ত ডিম প্রসবিত হয়। অনিষিক্ত ডিম থেকে

পুরুষ এবং নিষিক্ত ডিম থেকে কর্মী মৌমাছি বা ভাবী রাণী মৌমাছি সৃষ্টি হয়। এর ফলে একদিকে, কলোনিতে জনবিস্ফোরণ রোধ হয় ও খাদ্য আহরণ ক্ষেত্রের বিস্তার ঘটে, অন্যদিকে ভাবী বংশধরের জিনগত পটভূমিও উন্নত হয়। জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এ পদ্ধতিতে সম্ভবত মৌমাছিরা সংরক্ষণ ও সাফল্যের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে কাজ করেছে।

৭. **জনগণতান্ত্রিকতা** : একটি কলোনিতে রাণীই প্রধানতম ব্যক্তিত্ব। রাণীর উপরই নির্ভর করে একটি চাকের সম্পূর্ণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ও ক্ষমতা, জীবনের প্রতিটি ছন্দ ও কর্মশক্তি। সমগ্র মৌমাছি গোষ্ঠীকে রাণীই পরিচালিত করে। তাই রাণী মৌমাছিকে একটি জাতির সম্রাজ্ঞী, এমনকি দেবী হিসেবে অভিহিত করা হয়। তা সত্ত্বেও রাণীর অনেক কাজই কলোনির অন্যান্য সদস্যের সিদ্ধান্তে করতে হয়। যেমন- উপযুক্ত সময় এবং মৌমাছিদের সঠিক প্রস্তুতি ছাড়া রাণী একটি ডিমও পাড়ে না। জন্মগত বিরোধিতার কারণেই রাণী কখনও শূন্য রাণী কুঠুরিতে ডিম পাড়ে না, কিন্তু অন্যেরা তাকে সে কাজেই বাধ্য করে। সোয়ার্মিং এর সময়ও রাণী তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বাস্তুত্যাগে উৎসাহী মৌমাছিদের চাপে চাক ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। রাণী অন্যান্য মৌমাছিদের কাছ থেকে যেমনি শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জন করে, রাণীও তার বিনিময়ে খাদ্যের নিশ্চয়তা বিধান ও মৌমাছিদের সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে নেতৃত্বে বহাল থাকে। অপরদিকে ভবিষ্যৎ সোয়ার্মিং- এ অংশগ্রহণকারীদের চাপে শূন্য রাণী কুঠুরিতে ভাবী রাণী সৃষ্টির উদ্দেশে ডিম পেড়ে গণতন্ত্রের সুবাতাস বইতেও সাহায্য করে। এ কারণেই মৌমাছির কলোনি একদিকে চিত্তাকর্ষক, অনুসরণীয়, অন্যদিকে, স্বৈরাচারদের জন্য এক ঈর্ষণীয় সমাজবন্ধন।

৮. **উত্তরাধিকার নির্বাচন** : মৌচাকে রাণীর মৃত্যু হলে মৌমাছিদের মধ্যে আতংকের ভাব ফুটে উঠে। রাণী ছাড়া মৌমাছিরা বাঁচতে পারে না বলে তারা তিন দিন বয়সের এক বা একাধিক ডিম বেছে নিয়ে সুপ্রশস্ত খোপে রেখে দেয়। রাণী হিসেবে নির্বাচিত লার্ভাকে বিশেষভাবে প্রস্তুত **রাজসিক জেলি** খাওয়ানো হয় বলে সেটি রাণী মৌমাছিরূপে বেড়ে উঠে। এভাবে ষোল দিনের মধ্যে মৌমাছিরা নতুন রাণীকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলে।

৯. **রাণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ** : অনুচর কর্মী মৌমাছিরা রাণীর পরিচর্যা করে। রাণীর দেহ পরিস্কার করা, শরীর আঁচড়ান, মৌচাক থেকে মল অপসারণ ও পুষ্টিকর রাজসিক জেলি খাওয়ানো তাদের কাজ। রাণী মৌচাকের যাবতীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে আজীবন এক অটুট সমাজ পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে। তাই বলে রাণীর জুলুম-নির্যাতন ওরা মুখ বুজে সহ্য করে না, বরং আক্রমণাত্মক বিদ্রোহ ঘোষণা করে রাণী-মৌমাছিকে হয় তাড়িয়ে দেয় নয়তো মেরে ফেলে। এভাবে একেকটি চাকের মৌ-সমাজ টিকে থাকে।

১০. **চুরি-ডাকাতি** : একটি জাতি যখন অসতর্ক ও বিশৃঙ্খল থাকে, সে সুযোগে বহিঃশত্রু কীভাবে অনধিকার প্রবেশ ঘটিয়ে সর্বস্ব লুটে নেয় তাও মৌমাছি-কলোনির অবস্থা দেখে অনুমান করা যায়। যে কোনো তুচ্ছ ব্যাঘাতের কারণে কলোনি-জীবনের ঐকতান ছিন্ন হয়ে যায়, চাকে ও মাঠে কাজের ছন্দপতন ঘটে। তখন খোলা চাক থেকে মধুর কড়া গন্ধ ছড়াতে থাকে। মৌমাছিরা শত শত মিটার দূর থেকে এ গন্ধ পায়। খোলা চাকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মধুর গন্ধে বিমোহিত হয়ে অন্য চাকের মৌমাছিরা দ্রুত যাত্রাপথের পরিবর্তন ঘটিয়ে রক্ষীবিহীন, অরক্ষিত প্রবেশ পথের ভেতর দিয়ে চাকে প্রবেশ করে, এবং আকুণ্ঠ মধু পান করে লুণ্ঠিত দ্রব্যসহ চাকে ফিরে যায়। ফেরার আগে অঞ্চলটি চিনে রাখার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে। এখানে একটি খোলা চাক আছে এমন সংকেতও দিয়ে যায় যাতে অন্যরা মধু লুট করতে পারে।

মৌমাছির সামাজিক জীবনযাত্রা এমনই চিত্তকর্ষক, তাদের আচরণ ও কাজের বৈচিত্র্য এমন বিস্ময়কর যা দেখলে মনে হবে মানুষের মতো মৌমাছিরও হয়তো আবেগ, আনন্দ, দুঃখ, ভালোবাসা আছে, আছে আত্মত্যাগের মনোভাব। মৌমাছির সামাজিক জীবন এভাবে মানুষকে লক্ষ বছর ধরে ভাবিত করে রেখেছে, এখনও অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

রাণীর মৌমাছির কাজ

১। রাণী মৌমাছি কলোনিতে একমাত্র প্রজননক্ষম স্ত্রী মৌমাছি।

২। এরা ডিম পাড়ে এবং কলোনির প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে।

৩। জীবদ্দশায় একটি রাণী মৌমাছি প্রায় দেড় লক্ষ ডিম পাড়ে।

৪। রানী মৌমাছি কলোনির স্বার্থে কঠোরভাবে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে।

৫। এরা কখনোই কলোনি ত্যাগ করে না।

৬। এরা অবিরাম বাচ্চা উৎপাদন করে কলোনির আকৃতি সমৃদ্ধ করে।

৭। রাণী মৌমাছির মস্তক থেকে ক্ষরিত তরল ফেরোমন (Pheromone=Oxydecenoic acid) মৌচাকের বিভিন্ন সদস্যদের সংঘবদ্ধ রাখতে সাহায্য করে।

পুরুষ মৌমাছি (Drones)

গঠন: ড্রোন কলোনির প্রজননক্ষম পুরুষ মৌমাছি। কলোনিতে 300-3000 পর্যন্ত ড্রোন থাকে। এরা কর্মী ও রানীর মাঝামাঝি আকৃতির, প্রশস্ত দেহ, বৃহৎ চক্ষু, ক্ষুদ্রাকার তীক্ষ্ম চোয়াল বিশিষ্ট হয়ে থাকে। এদের মোমগ্রন্থি, মধু সংগ্রহকারী যন্ত্র ও হুল থাকে না কিংবা মুখোপাঙ্গ খাদ্য সংগ্রহের উপযোগী নয়।

আচরণ: এরা মৌচাকের অলস প্রকৃতির ও কোলাহল সৃষ্টিকারী সদস্য। এরা প্রতিরক্ষা বা খাদ্য সংগ্রহের কাজে অংশগ্রহণ করে না। এরা এমন অলস প্রকৃতির যে নিজের খাদ্য নিজে গ্রহণ করে না। কোনো কারণে কর্মী মৌমাছি না খাওয়ালে এরা মারা যায়।

উৎপত্তি: অনিষিক্ত ডিম থেকে পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় পুরুষ মৌমাছি সৃষ্টি হয়। তাই এরা হ্যাপ্লয়েড (n) প্রকৃতির হয়ে থাকে।

পুরুষ মৌমাছির কাজ

পরিণত পতঙ্গে রূপান্তরিত হওয়ার 10 দিন পর এরা রাণীকে নিষিক্ত করতে সক্ষম হয়। প্রায় 500 পুরুষ সঙ্গম উড্ডয়নে অংশ গ্রহণ করে। সঙ্গমই পুরুষ মৌমাছির একমাত্র কাজ। এরা জীবনে কেবল একবার রানী মৌমাছির সহিত যৌন মিলনের আকাঙ্খায় অপেক্ষা করে এবং মিলনের পর মৃত্যুবরণ করে। প্রজাতির বংশ রক্ষার্থে পুরুষের এরকম আত্মত্যাগ কেবল পরার্থপরতাই প্রকাশ করে।

কর্মী মৌমাছি (Workers)

গঠন: কর্মী মৌমাছি কলোনির মধ্যে সবচেয়ে ছোট আকারের মৌমাছি। এরা বন্ধ্যা স্ত্রী (sterile female) জাতীয় মৌমাছি। এরা কালো বা বাদামী বর্ণের হয়ে থাকে। এদের দেহ ও পা ঘন সন্নিবিষ্ট লোম বা ব্রিসল দ্বারা আবৃত থাকে। এদের মুখোপাঙ্গ চর্বণ ও লেহন (chewing and lapping) উপযোগী। এদের উদরের শেষ প্রান্তে একটি হুল (sting) থাকে। এদের পশ্চাৎ বক্ষে বিদ্যমান পায়ে রেণু থলি (poollen basket) ও রেণু চিরুনী (pollen comb) থাকে। এদের উদরের অঙ্কীয় দিকে একটি মোমগ্রন্থি (wax gland) বিদ্যমান থাকে।

উৎপত্তি: একটি মৌচাকে কর্মী মৌমাছির সংখ্যা 60,000 থেকে 80,000 পর্যন্ত হয়ে থাকে। নিষিক্ত ডিম থেকে উৎপন্ন হলেও এরা জননে অক্ষম। যেসব লার্ভাকে শ্রমিক মৌমাছিরা মৌরুটি সরবরাহ করে তার পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় কর্মী মৌমাছিতে পরিণত হয়। (মৌরুটি:শ্রমিক মৌমাছির হাইপোফ্যারিনজিয়াল গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত পদার্থ, মধু ও নেকটারের সঙ্গে মিশে যে মিশ্র খাদ্য সৃষ্টি হয় তাকে মৌরুটি বা বি ব্রেড বলে)। বৃদ্ধির সপ্তম দিন থেকে এরা মৌচাকের বাইরে আসতে সক্ষম হয়। কেবলমাত্র 20 দিন বয়সের পরেই নেকটার ও রেণু সংগ্রহ করার জন্য এদের উড্ডয়ন শুরু হয়। এরা প্রায় 6 সপ্তাহ বেঁচে থাকতে পারে।

আচরণ: এরা মূলত মৌচাকের পরিচ্ছন্নতা, বাচ্চার যত্ন নেয়া, খাদ্য অন্বেষণ ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করে। খাদ্য অন্বেষণকারী মৌমাছি মৌচাকের নিকটে দু'ধরনের নৃত্য (চক্রাকার নৃত্য ও ওয়াগল নৃত্য) প্রদর্শন করে অন্যান্য